বছরের এই মাসটির গুরুত্ব দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, কারণ ভ্যালেন্টাইন দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এই দু'টি দিনই আজকাল প্রায় সারা বিশ্বেই বেশ জাঁকজমকের সাথে পালন করা হয়। বাঙালির জাতিগত চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল গ্রহণশীলতা, তাই এই বিদেশি সংস্কৃতির অঙ্গকে নিজস্বরূপে বরণ করে নিতে বা আন্তর্জাতিক আহ্বানে আন্তরিক ভাবে সাড়া দিতে বোধহয় আমাদের সমকক্ষ আর কোন জাতিকেই খুঁজে পাওয়া যাবেনা...

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ২, সংখ্যা ৯

ফেব্রুয়ারী ২০২১

প্রেম সংখ্যা

কলম হাতে

স্বাগতা পাঠক, ডাঃ অমিত চৌধুরী, সামিমা খাতুন, আবদুল বাতেন, সুজন ভট্টাচার্য, প্রণব কুমার বসু, পিনাকি রঞ্জন বিশ্বাস, ডঃ মালা মুখার্জী, শুভা লাহিড়ী এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

**"খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।"**

(ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আনন্দের সেই হারানো কণিকা লুকিয়ে থাকে প্রেম-সম্পদের যবনিকার অন্তরালে। 'প্রেম ও প্রকৃতি' একাত্ম হয়ে থাকে আনন্দময় সুর-তাল-লয়ের সাথে। সাহিত্যে, শিল্পে কিংবা যে কোনো সৃষ্টিকর্মে 'প্রেম' একটি বিশেষ স্বাদ, যা সব শিল্পকর্মকে দেয় রসবোধের সার্থকতার শিরোপা। যদি সাহিত্যের পাতা উল্টেপাল্টে দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে সেই প্রাচীন যুগের সাহিত্য রচনা থেকে আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক যুগ ধরে সমান তালে 'প্রেম' পর্যায় একইভাবে মর্যাদা লাভ করেছে ও করছে।

তবে সাহিত্যে শুধুমাত্র প্রেমের আবেগপূর্ণ অনুভুতি প্রকাশের মধ্যে দিয়ে যথাযথ সৃষ্টিকর্মের ইতি টানা যায় না। সাহিত্যে 'প্রেম' পর্যায়ের লেখা তখনি সম্পূর্ণতা লাভ করে, যখন তার মধ্যে ফুটে ওঠে দৈনন্দিন বাস্তবতা কিংবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন মতাদর্শ। অর্থাৎ কেবল গতানুগতিক প্রেমের কাহিনী না, তার সাথে সমাজ, অর্থনীতি, বর্তমান রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের ছায়া থাকা অবশ্যই জরুরি। তবেই 'প্রেম' সাহিত্যে পদ্মমণির মতো বিকশিত হবে। ■

বিনীতা —রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন

Page Background Photo by Karolina Grabowska from Pexels

বই

রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য আর একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে 'অরণ্যমন'-এর দোকান থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

কলেজ স্ট্রীটে এবং কলকাতার বিভিন্ন বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে...

কলম হাতে

কলম হাতে

কলম হাতে

অনিবার্য কারণ বশত এই সংখ্যায় আমরা দীপঙ্কর সরকার-এর ধারাবাহিক উপন্যাস 'শিকড় (গাঁ গেরামের গপ্পো)' এবং কমিক -এর পাতা প্রকাশ করতে পারলাম না, এ জন্য আমরা দুঃখিত।

হরিদের কথা ও গণতন্ত্র

দেবাশিস চক্রবর্তী

আসলে এভাবেই ন্যারেটিভ, হয়তো একটা শক্তিশালী জমির ওপর দাঁড়ায়। আমাদের পোশাকি গণতন্ত্র হরির রসগোল্লার দিকে তাকানোকেও পাপ মনে করে, ফলে হরির রসগোল্লা খাওয়া হয় চূড়ান্ত অপরাধ। ফলে সুকুমার রায়কে ধার করে বলতে হয়, হরিদের চিরকালই এক মাসের জেল আর সাত দিনের ফাঁসি হয়। কিন্তু অবস্থা তখন আরো সাংঘাতিক হয় – যখন হরির বাড়িতে, পাত পেড়ে খেতে সেলিব্রিটি নেতারা আসেন – মিডিয়া হরির রান্নাঘরে ঢুকে যায়। আলু কুমড়োর চচ্চড়ি থেকে বেগুন ভাজা হয়ে, শেষপাতে 'হিন্দুত্ববাদী' নেতার জন্য তুলে রাখা ডায়াবেটিস ফ্রী সন্দেশ – এসব নিয়ে চ্যাম্পিয়ান পিঁয়াজের মতই বাজার গরম করে মিডিয়া। অথচ ওই নেতার কাছে হরি বলতে পারেনা, তার বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাটার কথা। তার মেয়ের নার্ভের অসুখের কথা।

সুতরাং হরিরা দৌড়ায়। তাদের জীবন নিয়ে, কেতাব লেখা হয় আর বিদেশে সেসব কেতাব হেব্বি দামে বিক্রিও হয়। কিন্তু হরিরা সেসব বই পড়তে পারে না। সুতরাং হরি দলিত হোক কি মুসলমান, বা নিখুঁত বর্ণহিন্দু – তাতে কিছু এসে যায় না। হরিদের দৌড়ের কিছু এসে যায় না।

(*শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর একটি লেখার প্রভাবে, এই রচনা।)

পাঠকের দরবার

সায়ন দত্ত
কলেজে পাঠরত

জানুয়ারি সংখ্যার পাঠ প্রতিক্রিয়া

গুঞ্জনের জানুয়ারি সংখ্যাটি প্রথম পেলাম এক বন্ধুর কাছ থেকে। প্রথমে আসি কভারের কথায়, কভারটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী, আর তার সাথে ছোটদের আঁকাগুলো খুবই সুন্দর। কমিক কবিতা ও তার আঁকাটি বেশ মজার। আমি খেলার বিষয়ে বিশেষ আগহী হওয়ার জন্য সুজন ভট্টাচার্যের লেখাটা আগেই পড়ে ফেলি — অসাধারণ লাগলো।

প্রশান্তবাবুর লেখা 'মাথাবদল'এর মাধ্যমে বিজ্ঞানকে নতুনভাবে জানাতে পারলাম। আধুনিক যুগে এ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরি।

'আশা' বিভাগের মধ্যে পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস, ডঃ মালা মুখার্জী, অনিমেষ বৈশ্য, সন্দীপ বাগ, নন্দিতা চৌধুরী, সমীর দাস, সিদ্ধার্থ বসু, ফাল্গুনী গিরি মণ্ডল, প্রণব কুমার বসু প্রমুখ লেখক-লেখিকাদের লেখাগুলি খুব ভালো লেগেছে, প্রত্যেক লেখার মধ্যে দিয়ে এক নতুন জীবন-ভাবনার ছবি পরিস্ফুটিত হয়েছে।

এছাড়া ধারাবাহিক লেখাগুলি ম্যাগাজিনে লিঙ্ক থাকার জন্য প্রথম থেকে জমিয়ে পড়া যাবে। গুঞ্জন ম্যাগাজিনের স্টাইল, দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। পরবর্তী সংখ্যা পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলাম। ■

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ কিছু ঘটনাকে পিছনে ফেলে...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১১ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

তৃতীয় পর্যায় (৪)

আজ শনিবার ২৮/৬/২০১৬। খুব ভোরে ওদের নর্মদে হর বলে বেড়িয়ে পড়লাম, ঐ বাড়ির একটি ছেলে আমাদের কিছুটা এগিয়ে দিলো। সকাল সাড়ে সাতটার সময় এলাম গয়ারি ঘাটে। এখানে নর্মদার সাথে সের নদীর সঙ্গম হয়েছে।

ঘাটের পাশেই একটি আশ্রমে গেলাম, একজন সাধু আমাদের সময় নষ্ট না করে এগিয়ে যেতে বললেন। বুঝলাম চলে যেতে বলছেন। সঙ্গমে স্নান করে সের নদীর দিক দিয়ে অন্য পাড়ে গেলাম নৌকা করে।

এই ঘাটের নাম সাগুন ঘাট। মাঝি টাকা নেবে না, আমরা পরিক্রমাবাসী বলে, প্রায় জোর করে কুড়ি টাকা দিলাম। রাস্তায় এসে দেখছি রাস্তা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটা পিচ ঢালা ভাল রাস্তা, সেটা গেছে জব্বলপুরের দিকে, অন্যটি দূর্গম, নদীর পাড় ধরে।

আমরা দ্বিতীয় পথটা ধরলাম। এলাম নারসাই গ্রামে। পাড় ধরেই এগিয়ে চলেছি, এখন দশটা বাজে, চা তো দুরস্ত একটু জল পর্যন্ত নেই আমাদের কাছে। নদীতে নামাও খুব কষ্ট সাধ্য। তাই "আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ।" সাড়ে

নমামি দেবী নর্মদে

দশটার সময় পাড়ের ওপরে একটা গেরুয়া পতাকা দেখলাম, খুব কষ্টে পাড়ে উঠলাম। খুব বড় আশ্রম। মহারাজ আমাদের বিশ্রাম নিতে বললেন, গ্রামটার নাম রেবা নগর। প্রায় এক ঘণ্টা পড়ে মহারাজ আমাদের পরিক্রমার পথ দেখিয়ে দিলেন। মহারাজ বলেছিলেন তিন কিলোমিটার, কিন্তু আমার মনে হল চার কিলোমিটারের কম হবে না। পাড় ধরে খুব কষ্ট করে এলাম সপ্ত ধারায়। পাহাড়ের বুক চিড়ে সাতটি ধারাতে নর্মদা পৃথিবীতে নেমে আসছে।

সেই দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবেনা। বর্ণনা করার মত ভাষা জ্ঞান আমার নেই। পাড় ছেড়ে রাস্তায় এলাম, ছাব্বিশ নম্বর জাতীয় সড়ক। দুপুর বারোটা বাজে, কিন্তু থাকার জায়গা পাইনি। একটি আশ্রম পেলাম ঠিকই, কেউ নেই। বসারও জায়গা নেই, ভীষণ সূর্যের তাপ, তাই "পথে এবার নামো সাথি" — নদীর পাড় ধরে চলেছি। এখানেও নাকি সূর্যদেব তপস্যা করেছিলেন, তাই প্রতি রবিবার মেলা হয়, আজ শনিবার। দু'ঘণ্টা পাড় ধরে চলার পর এলাম বরমান ঘাটে। অনেকটা চড়াই ভাঙার পর একটি আশ্রমে এলাম। সাধু-ভাণ্ডারা হচ্ছে। একজন মাতাজী আমাদের থাকার জায়গা দিলেন। যাঁরা ভাণ্ডারা দিচ্ছিলেন তাঁদের বললেন, "মা তোমাদের প্রসাদ গ্রহণ করেছেন, তাই চারজন পরিক্রমাবাসী এসেছেন, ওঁদের সেবা করো।" বিকাল চারটের সময় মধ্যাহ্ন ভোজনের পড়ে আর হাঁটার শক্তি নেই, কাকাজী আর অশোকবাবু শুয়ে পড়লেন। আমি

নমামি দেবী নর্মদে

আর দিব্যানন্দজী ওঁদের অনুসরণ করলাম। কাল আমরা ফিরে যাবো, তাই আরো কিছুটা রাস্তা এগিয়ে যেতে পারলে ভাল হত, কিন্তু মা হয়তো অন্য কিছু ভেবেছেন।

ছ'টার সময় ঘাটে গেলাম, স্নান করে তর্পণ করলাম পিতৃপুরুষের। অর্থাৎ তাপিত হলাম। চোখের জলে শ্রদ্ধা জানালাম। এখানে ব্রহ্মা তপস্যা করেছেন তাই জায়গাটি তাঁর নামে। নদীর মাঝখানে একটি পাহাড়ের মতো উঁচু টিলার ওপর মন্দির আছে কিন্তু পরিক্রমাবাসীরা ওখানে যেতে পারেন না। ওখানে গেলে পরিক্রমা খণ্ডন হয়ে যেতে পারে। আমরা ফিরে এলাম আশ্রমে। আরতি করে এবারের মত পরিক্রামার ইতি টানলাম।

আজ ২৯/৬/২০১৬। খুব সকালে বেড়িয়ে পড়েছি, তিন কিলোমিটার হেঁটে বাস রাস্তায় এলাম। ষোলো কিলোমিটার বাসে করে এলাম করলী নামে এক শহরে, ওখান থেকে আড়াই ঘণ্টা ট্রেনে করে এলাম জব্বলপুর। আজ রাত বারোটায় ট্রেন, কলকাতা ফিরে যাওয়ার। আবার কিছু দিনের অপেক্ষা, মনে হচ্ছে ঘর ছেড়ে মার কোল ছেড়ে প্রবাসে যাচ্ছি... (তৃতীয় পর্যায় সমাপ্ত)

নর্মদে হর। ...ক্রমশ ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ আলোকছটা...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

বুড়ো বয়সে হাতে খড়ি

নবীন চৌধুরী

(৩)

স্কুলে গিয়ে দেখি আজকের অনুষ্ঠান অনেক আগেই শুরু হয়েছে। টিচার্সদের কমন-রুম ফাঁকা, নরোত্তমদা (স্কুলের দপ্তরি) বললেন, "একটু দাঁড়ান, এক্ষুনি স্যার আসবেন।" সত্যি তাই, পাঁচ মিনিটের মধ্যে হেড স্যার হাজির। রুমে ঢুকেই আমার হাতের খাতাটা লক্ষ্য করে সমীরদা বললেন, "কি কবিতা না অন্য কিছু!" আমি খাতাটি সমীরদার হাতে দিতে দিতে বললাম, "এটা একটা গ...।" কথাটা শেষ হয়নি। সমীরদা ততক্ষণে শেষ পাতা থেকে প্রথম পাতা পর্যন্ত ব্যাংকের ওস্তাদ লোকেদের কায়দায় আঙুল চালিয়ে আমায় বললেন, "কাল রাতে এই মোটা খাতা লিখে শেষ করে ফেলেছ?" আমি বুক ফুলিয়ে বললাম, "সে কি আর বলতে। সারা রাত সারাদিন ঘুমোইনি।"

সমীরদা আমার বড় বড় লাল চোখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, "এই মরেছে।" সঙ্গে সঙ্গে আবার বললেন, "আমার চেম্বারে মাস্টারমশাইরা অনেকক্ষণ হল লাইব্রেরির বই সিলেকশনের মিটিংয়ে বসে আছেন, আমি গেলে ওনারা ছাড়া পাবেন। তুমি খাতাটি নিয়ে আমাদের

টুকরো স্মৃতি

স্টেজ সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান আলিপুরদুয়ার কলেজের বাংলার প্রফেসর অর্নব সেনের কাছে চলে যাও। উনি বুঝে নিয়ে তোমায় প্রোগ্রাম দিয়ে দেবেন।”

আমি বললাম, “তা কি করে হয়, ভদ্রলোককে আমি চিনি না জানি না এমনকি কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ওনার কাছে আপনি আমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন!” সমীরদা বললেন, “কি যে বলো, অর্নববাবু খুব ভালো মানুষ। আমি বাংলায় ডক্টরেট হতে পারি, কিন্তু অর্নব সেন বাংলা ভাষায় সত্যিকারের একজন ওস্তাদ মানুষ। তাই একটা প্রটোকল মেনটেইন করে আমাদের চলতে হয়, তুমি নিশ্চিন্তে যেতে পার, ঠিক আছে, নরোত্তম যাও তো ওনার সঙ্গে এবং অর্নববাবুকে বলবে আমি পাঠিয়েছি। কি হে, এবারে খুশি হয়েছ তো?” আমি বললাম, “ঠিক আছে আপনি নিজের কাজ করুন, বাকিটুকু আমি ঠিক সামলে নেব।”

নরোত্তমদা’র সাথে সাথে আমরা পৌছে গিয়েছি গ্রীন রুমের বাইরে – যেখানে সেজে আছে দ্রোনাচার্যের চক্রবুহ্য। তখন নরোত্তমদা হাঁক দিয়ে অর্নব সেনকে বললেন, “স্যার, আমাদের হেড স্যার ওনাকে পাঠিয়েছেন।” নরোত্তমদা ফিরে গেলেন।

নরোত্তমদা যেতে যেতেই হঠাৎ কেন জানি না মহা-ভারতের অভিমন্যু বধের কথা আমার মনে পড়ে গেল। চোখের সামনে চক্রবুহ্যর মাঝে দাঁড়িয়ে স্বয়ং দ্রোনাচার্য অর্থাৎ বাংলার প্রফেসর অর্নব সেন, আর তাঁকে ঘিরে আছে

এই মহাযুদ্ধের বাকি রথি মহারথীরা। জয়দ্রথ'র মতো চুল আছে এমন একজন কবি আমাকে চক্রবুহ্যে ঢোকার জন্য রাস্তা তৈরি করে দিল। সবার লক্ষ্য আমার সেই অত্যাধুনিক মিসাইলটির দিকে যেটা এখনও টেস্ট করা হয়নি।

চক্রবুহ্যে ঢুকে পড়া মাত্রই দ্রোনাচার্যের শক্তিশেল শুরু হল।

— কি চাই?

— আমি স্কুলের প্রাক্তনী, একটি লেখা নিয়ে এসেছি যেটা আমি এই মঞ্চে পরিবেশন করতে চাই।

— ওটা কি কবিতা?

— না।

— ওটা কি ফিচার?

— বলতে পারব না।

— ছোটগল্প না বড়গল্প?

— বলতে পারব না।

— রম্যরচনা?

— বলতে পারব না।

— উপন্যাস?

— বলতে পারব না।

ততক্ষণে রথি-মহারথীরা মুচকি মুচকি হাসতে শুরু করেছে। আমি খাতাটি এগিয়ে দিয়ে সেনাপতিকে বললাম, দয়া করে আপনি যদি একটু দেখে নেন। 'আমার সময় নেই' বলে সেনাপতি কিছুটা দূরে সরে গিয়ে নিজের

অবস্থান সম্পর্কে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। রাগে দুঃখে যত দূরে ফিরে যাচ্ছি তত জোরে অট্টহাসিতে মেতে উঠেছে ওই রথি-মহারথীর দল – যেন প্রথম শেলেই অভিমন্যু ‘বধ’ হয়েছে। তবে আমিও দমবার পাত্র নই, আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি এই স্পেশালিষ্ট ডাক্তারকে দিয়েই আমি আমার রোগীর ট্রিটমেন্ট করিয়ে ছাড়ব।

সমীরদার কাছে আবার ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলাম, “সমীরদা ওই অর্নব সেন লোকটা ক’টা নাগাদ রোজ এখানে আসেন। সমীরদা বললেন, “দেখ, ভদ্রলোক কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে রোজ দুপুর বারোটা নাগাদ এখানে চলে এসে বইমেলা, মঞ্চ সবকিছু দেখাশোনা করেন, ফিরতে ফিরতে আবার সেই রাত এগারোটা।” আমি বললাম “টিফিনের ব্যবস্থা কি হয়েছে?”

— টিফিন বলতে ওই চা কফি কেক বিস্কুট, সবার এক।

— ঠিক আছে বলে সমীরদার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

বাড়ির পথে রিকশায় বসে অনভিপ্রেত অসুখের জন্য সবে মাত্র দুটো দম দিয়েছি, আমার মনের কোণে ভেসে এল সেই রাইটার্স বিল্ডিং, যেখানে আমার অবারিত দ্বার। পি. ডব্লু. ডি.র ফার্স্ট ক্লাস কন্ট্রাক্টর, শহরে যথেষ্ট সুনাম আছে, আর এই সামান্য দ্রোনাচার্য বলে কি না “আমার সময় নেই” না না এ হতে পারে না।

আমারও সময় নেই, পাঁচদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে এই

টুকরো স্মৃতি

গোল্ডেন জুবিলি উৎসব, তাই আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে এর বিহিত চাই। বাড়ি ফিরে ফোন করে আমার নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনীকে এই সেনাপতির ঠিকুজি কুষ্ঠী বের করতে বললাম।

ছত্রিশ ঘন্টা পর থেকে খবর আসতে শুরু করেছে এই দ্রোনাচার্যের বাবা একজন ইঞ্জিনিয়ার। প্রফেসরের স্ত্রীর নাম পুতুল। শ্বশুর বাড়ি আলিপুরদুয়ারে। দ্রোনাচার্যের স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে জলপাইগুড়ির হাকিম পাড়ায়। শান্তশিষ্ট মার্জিত পরিবার। সমসাময়িক সাহিত্যিক, বন্ধুসম দাদা দেবেশ রায় এ.সি. কলেজের এক বছরের সিনিয়র ছিলেন। সমরেশ মজুমদার জেলা স্কুলের চার বছরের জুনিয়র। তবে সমীর রক্ষিত ফনীন্দ্র চন্দ্রের ছাত্র, তারপর বি.ই. কলেজ থেকে পাশ। তাই যোগাযোগ প্রায় ছিল না বললেই চলে, তবে বর্তমানে বন্ধুত্ব আছে। এই সেনাপতি ভালো ছাত্র, স্কুল কলেজে ফার্স্ট ডিভিশন তাই প্রথম ইন্টারভিউতে আলিপুরদুয়ার কলেজে চাকরি পেতে কোন অসুবিধা হয়নি। এই সেনাপতি খেতে ভালোবাসেন সঙ্গে খয়ের ছাড়া একশো বিশ মিষ্টি পাতা পান খুব পছন্দ। কাজের খবর – লোকে বলে 'উনি চাঁদের দেশের লোক।' এই উদ্ধৃতি দিলে রেগে যেতে পারেন।

তথ্যগুলো বিবেচনার পরে সকালে ঠিক করলাম, আমি বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ স্কুলে যাব, যখন সেখানে লোকজন

সাধারণত থাকে না। তখন মেইন গেটের কাছে, স্কুলের ভিতরে বড় রেইন ট্রি গাছটার তলায় যে অস্থায়ী ক্যান্টিনটা আছে তার মালিককে দিয়ে আগেই দোকানটা খুলিয়ে রাখতে হবে। অঙ্ক কষে দেখতে হবে সব যেন ঠিকঠাক চলে।

আমি আমার চৈতক স্কুটারটা গাছের তলায় দাঁড় করিয়ে, পনেরো বিশ মিনিট ধরে লক্ষ্য করছি, প্রফেসর একবার মঞ্চে যাচ্ছেন। আবার কিছুক্ষণ পরেই বইমেলাতে ফিরে যাচ্ছেন। দেখে বোঝা যায় উনি প্রায় শ্রান্ত, বিধ্বস্ত। তৃতীয়বার প্রফেসর যখন মঞ্চের দিকে আসছিলেন আমি হাতের ইশারায় ওনাকে ডাকলাম। উনি কাছে এলেন। ক্যান্টিনের ঝকঝকে টেবিল ও বেঞ্চগুটি দেখিয়ে বললাম "শরীরে অনেক ধকল যাচ্ছে একটু জিরিয়ে নিন।" উনি রাজি হলেন।

আমি দোকানের ছেলেটিকে বললাম, "দু'টো এগরোল দাও।" উনি কিছু বলেননি। খেতে খেতে বললাম কফি চলবে? উনি মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিলেন। আমি কিছুক্ষণ আগেই স্নান সেরে খেয়ে এসেছি, খুবই ধীর গতিতে খাচ্ছিলাম কিন্তু বড়সর চেহারার প্রফেসর মশাইতো তিনবারেই এগরোলকে হাওয়া করে দিয়েছেন। এতে দোষের কিছু নেই। যত বড় ইঞ্জিন তত বেশি তেল চাই। পরমুহূর্তেই আমি আরও দুটি এগরোলের অর্ডার দিলাম। মনে হলো উনি খুশি হয়েছেন। বইমেলা নিয়ে কথা চলছে। ছেলেটি এগরোলগুলো দিতে এল, আমি বললাম দু'টোই ওখানে।

টুকরো স্মৃতি

এবারে প্রফেসর বললেন “তা কি করে সম্ভব।” আমি তখন বুঝিয়ে বললাম, “আমি একটু আগেই ভাত খেয়ে এসেছি, আবার সন্ধ্যাবেলা সাধারণত এসব খাওয়া হয়ে থাকে, তাই আপনি দয়া করে খেয়ে নিন।” শেষটায় উনি রাজি হলেন। কফি চলে এসেছে। এবারে আমি টাকা বের করে দোকানের ছেলেটিকে বললাম, “মাধব মোড় থেকে চারটে পান নিয়ে আয়, মিঠে পাতা একশো বিশ, খয়ের নয়।” এটা সেটা গল্প করতে করতে পান চলে এসেছে। দু’জনে দুটি পান মুখে দেবার পর আমি মনের কথাটি ওনাকে বললাম। প্রফেসর মুচকি হেসে বললেন, “বুঝেছি, ‘নুন যখন খেয়েছি গুন-তো গাইতেই হয়’ শনিবার অনুষ্ঠান শেষ হচ্ছে, রবিবার ঠিক বেলা বারোটায় আমার বাড়িতে।” আমি রাজি হয়ে গেলাম। আমি সেখান থেকে যখন ফিরছি মনে মনে বলছি, কতশত বাজখাই ইঞ্জিনিয়ারকে বশে এনেছি, ইনি তো একজন সামান্য মাস্টারমশাই।

বেলা বারোটা বাজতে দু’মিনিট বাকি। সাধের রাবার ব্যান্ড লাগিয়ে পেঁচিয়ে রাখা খাতাটি স্কুটারের ডিকি থেকে বের করে খবরের কাগজটিকে ছাড়িয়ে নিলাম। যেই না বার’টা বেজেছে সাথে সাথে কলিং বেল। ভেতর থেকে একজন ভদ্রমহিলা কোলাপসিবল গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলেন “কাকে চাই?”

আমি বললাম, “অর্নব বাবু বাড়ি আছেন।” উনি বললেন,

টুকরো স্মৃতি

“না উনি তো বাড়িতে নেই।” এবারে আমি বললাম, “আপনি কি ঠিক বলছেন, আমায় তো উনি বারোটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন।” ভদ্রমহিলা সম্ভবত পুতুল ম্যাডাম, আমার বে-জোর কথায় সম্ভবত অপ্রস্তুত হয়ে একবার আমার দিকে আর একবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে কি বুঝেছেন কে জানে!

— উনি তো এডওয়ার্ড লাইব্রেরির মিটিংয়ে গিয়েছেন, ঠিক আছে বলে ভেতর থেকে চাবিটা এনে কোলাপসিবল গেটটি খুলে আমায় বসতে বললেন। আমাকে ছেড়ে উনি যখন ঘরের ভেতরের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন আমি বললাম, “এক কাপ চা হবে কি?” উনি মুচকি হেসে ভেতরে চলে যান। একটু বাদেই প্লেটে করে একখানা সন্দেশ ও এক গ্লাস জল দিয়ে যান। তারপর এক কাপ সুস্বাদু চা। আমি খুশিতে আটখানা।

বেলা ক্রমশ বাড়ছে কিন্তু দ্রোনাচার্যের দেখা নেই, বারবার মেইন গেটের বাইরে যাচ্ছি, একটা করে সিগারেট ধরিয়ে দম দিচ্ছি আবার ফিরে এসে সেই পেল্লাই একখানি টেবিলের সামনের দিকে যে বেঞ্চটি আছে তাতে এসে বসছি। টেবিলের দু’ধারে আরও দুটি বেঞ্চ আছে, অপর দিকে মাস্টার মশাইয়ের তোয়ালে জড়ানো চেয়ার। বেলা দেড়’টা বাজে। মনে মনে বিরক্তির ভাব আসাটা স্বাভাবিক। একজন ইম্পরট্যান্ট মানুষের সময় এভাবে অপচয় হয়ে যাচ্ছে, ভাবা যায় না।

টুকরো স্মৃতি

হঠাৎ করে কলিং বেল বেজে উঠল। খুশিতে বাইরে এসে দেখি কোলাপসিবল গেটের বাইরে পা-জামা পাঞ্জাবি ও কাঁধে ঝোলা নিয়ে সেই জয়দ্রথ স্বয়ং হাজির।

আমি বললাম, "অর্নববাবু এখুনি ফিরবেন, আপনি ভেতরে বসুন।" দু'জনে পরিচিতি হলাম, ওনার নাম রামেশ্বর। ওনার কবিতার বই ছাপা হচ্ছে, তাই একটি কবিতার প্রুফ আপাতত দেখিয়ে নিতে এসেছেন। আমি মনে মনে খুব খুশি হয়েছি। ভাবলাম, কোনদিন এ লাইনটা নিজে সামনাসামনি দেখিনি, ওনার কবিতাটি শোনা যাক, বেশ একখানা আইডিয়া পাওয়া যাবে। যেই না কথাটা ওনাকে বললাম, সঙ্গে সঙ্গে উনি টেবিলের ওপর রাবার ব্যান্ড লাগানো খাতাটি দেখিয়ে আমায় বললেন, "মনে হয় আপনিও একখানা লেখা এনেছেন, আগে আপনারটা পড়েন, তারপর আমারটা হবে।"

আমি মনে মনে বললাম, "ওরে বাপু, আমি বাংলায় ডক্টরেট করা লোককে এ লেখা পড়তে দিইনি আর তুমি কে হরিপদ!" আমি হুঁ'স শব্দ করে বললাম "ঠিক আছে।" এরপর আমি বেঞ্চটির আরও ধারে সরে বসলাম। নিঝুম, চুপচাপ, নিজেদের মধ্যে কথা নেই, দেওয়াল ঘড়ির টকটক শব্দ শুনতে পাচ্ছি — দু'টো বেজে গেছে। ...ক্রমশ ■

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ ফোক পেন্টিঙ্গ (Folk Painting)...

শিল্পীঃ নৈঋতা দাস ✧ বয়সঃ ১৪ বছর

ছবির নামঃ অ্যাক্রিলিক পেন্টিঙ্গ (Acrylic Painting)...

শিল্পীঃ সঞ্জনা দাস ✧ বয়সঃ ১২ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীদের ছবিগুলো কেমন লাগল...

ধারাবাহিক উপন্যাস

চার ঋতু-অধ্যায়

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(৭)

প্রথমে তারা গিয়ে পৌঁছালো আগ্রা থেকে প্রায় ৩৬ কিমি দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত, ঐতিহাসিক দুর্গ প্রাসাদ ফতেহপুর সিক্রিতে। পিকু সবাইকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গের প্রবেশ দ্বারের সামনে দাঁড় করিয়ে বলতে শুরু করল, “ওয়েলকাম, ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি অভূতপূর্ব নিদর্শন হল এই ফতেহপুর সিক্রি। ১৫৬৯ সালে মুঘল আমলে সম্রাট আকবর এইখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। এই দুর্গ প্রাসাদটি সম্পূর্ণ রক্তবর্ণ বেলেপাথর দিয়ে নির্মিত। এই প্রাসাদের প্রধান তোরণ দ্বারটি প্রায় ৫৪ মিটার উঁচু, এটি বুলন্দ দরওয়াজা নামে পরিচিত, আর সবথেকে বড় কথা এটি এশিয়ার সবথেকে উঁচু তোরণদ্বার। আমরা ভিতরে আরও নিদর্শন দেখব, সেটা চলুন যেতে যেতে বলছি।” সবাইকে নিয়ে ভিতরে গিয়ে একে একে চারপাশের পরিখা, ভেতরের জলধারা, অট্টালিকা, প্রমোদকুঞ্জ, স্নানাগার, সেলিম চিশতির দরগা দেখাতে থাকল। এরপর সবাইকে যে যার মতো ফটো তুলতে ব্যস্ত দেখে, পিকু সেই ফাঁকে তনিমাকে ফোন করল।

ফোনে এটা সেটা কথা বলতে বলতে কিছুক্ষণ বাদে পিকুর নজর গিয়ে পড়ল দরগার ভিতরে। বাকিরা দরগার বাইরে থাকলেও একজন তখনও ভিতরেই আছে, সে হল রাহুলের স্ত্রী কেয়া। খুব অদ্ভুত লাগলো ব্যাপারটা পিকুর কাছে, "মুসলিম রীতি মেনে দোয়া করছেন! ওনার স্বামী! কই না তো, ভিতরে নেই তো?" পিকু ফোনটা রেখে দিয়ে দরগার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ বাদে কেয়া বেড়িয়ে এসে বললেন, "আরে মিস্টার পিকু, আপনি কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন! বাকিটা কি আমাদেরই দেখেশুনে নিজেদেরই বুঝে নিতে হবে নাকি?"

— না ঠিক তা নয়, মানে আপনি এখানে, এইভাবে...

— কি এতো আমতাআমতা করে বলছেন? একটু পরিস্কার করে বলুন, তবে তো বুঝব।

— আসলে সবাই বাইরে ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত। আর আপনি এইভাবে, মানে অন্য ধর্মমতের রীতিতে প্রার্থনা করছেন! একটু বিস্মিত হলাম আর কি!

— ও এই ব্যাপার। এই বলে একটা প্রানোচ্ছল হাসির রোল তুললেন, যেন মনে হল হাসির অন্তরালে উত্তরটা গোপন করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পিকু দমবার পাত্র নয়। সে পুনরায় সেই একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। অগত্যা কেয়া মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন, "আপনার দূর-দৃষ্টির তারিফ না করে পারছিনা। আপনি ঠিকই দেখেছেন।

আসলে আমার মনে হয় যখন কোনো ধর্মস্থানে, বা নতুন সংস্কৃতির সান্নিধ্যে আসি আমরা, তখন সেই সংস্কৃতি বা তাঁদের নিয়ম-রীতিনীতি বোঝার জন্য সেই মতোন করে সংস্কৃতিটাকে আপন করে নিতে হবে। আমি যেখানেই যাই সেটাই করার চেষ্টা করি। এখানে দেখলেন দোয়া মাঙ্গতে, আবার চার্চে যাই যখন ওনাদের রীতিতেই প্রে করি, ঠিক বৌদ্ধ, জৈন ধর্মস্থানে গেলে তাঁদের মতো করেই প্রার্থনা করি। আবার মন্দিরে গেলে প্রণাম। ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে গেলো তো! আসলে আমার কাছে মনুষ্যই পরম ধর্ম। বাইরটা যাই ভুল-ত্রুটি দিয়ে ভরাই না কেন, অন্তরের ঈশ্বরের কাছে শেষ জবাব দিহি ও মার্জনাটা চেয়ে মনুষ্যত্বেরই জয় কামনা করি সর্বদা। আমাদের এখানে আর কি কি দেখা বাকি আছে?"

এতক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়েই পিকু কথাগুলো শুনছিল, কিন্তু শেষ কথাটা যেন ভাব-সংলাপের মাঝে জল ঢেলে দিল। পিকু মনে মনে অসন্তুষ্ট বোধ করলেও প্রকাশ না করে বলল, "এই আর যোধা বাঈয়ের মহল, তিন ধর্মের তিন রানির মহল, দেওয়ানি-ই-খাস এর কারুকার্য খচিত তুরস্কের সুলতান বাসগৃহ।"

— আচ্ছা এখানেই দেওয়ালগুলোতে কবি ফৈজির সেই অসাধারণ কবিতা আর শিল্পকলার বিন্যাস অলংকৃত আছে? আমি এই বিষয়ে পড়েছিলাম।

— এই তো এখান থেকে বাঁ’দিকের প্রাসাদগুলো দেখছেন, ওইখান দিয়ে গেলেই দেখতে পারবেন। চলুন...আমি বাকিদেরও ফোন করে ওইদিকে চলে আসতে বলছি। আপনার হাসব্যান্ড মনে হয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

— আরে না ওকে আমি বলে এসেছি, আমিই এদিক সেদিকটা নিজের মতো ঘুরে দেখব। ডোন্ট ওয়্যারি। এটা হামেশাই হয়।

— তবে যাওয়া যাক ম্যাডাম।

— হোয়াই নট? লেটস গো। কিন্তু আপনি আমাকে কেয়া বলেই ডাকবেন।

— বেশ তাই।

দুজনের আবার সবার সাথে দেখা হল। একসাথে বাকি জায়গাগুলো দেখে তাজমহল, আগ্রা ফোর্ট ইত্যাদি দেখে ওনারা সেদিনের মতো হোটেলের দিকে রওনা হলেন। একদিনেই এই কয়েকজন মানুষ পিকুর খুব কাছের আত্মীয় হয়ে উঠলেন। বিশেষ করে কেয়া, যেন মনেই হচ্ছিল না এই সকালে তার সাথে আলাপ। কতদিনের চেনা পরিচিত বন্ধুদের থেকেও সে বেশি পরিচিত মনে হচ্ছিল। সবচেয়ে বেশি করে কেয়ার চিন্তধারা, জীবন সম্পর্কে যুক্তিবোধ বেশ অন্য রকমের লাগল।

রাতে বাড়ি ফিরে ঠিক ঘুম এল না পিকুর। বারবার মনে হচ্ছিল কখন সকাল হবে। আবার ঘুরেতে বেরবে। একটা

ধারাবাহিক উপন্যাস

অবাধ্য, অদম্য ছেলেমানুষি তাকে যেন পেয়ে বসেছিল। এতো দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছে, কত ধরনের মানুষের সাথে মিলেছে, মিশেছে। এমনকি অনেকটা সময়েও কাটিয়েছে বিভিন্ন মানুষের সাথে। কিন্তু এই ট্যুরটা যেন তার জীবনের বেস্ট ট্যুর। এতো দিনে যেন প্রাণবন্ত একটা ঘোরায় সামিল হতে পেরেছে সে।

দেখতে দেখতে পাঁচটা দিন কেটে গেলো। পিকুর সাথে দিল্লির সব জায়গা দেখা ঘোরা প্রায় সুসম্পূর্ণ হয়েছে। তবে মথুরা আর বৃন্দাবন ঘুরে ওনারা বাড়ি ফিরবেন এবারের মতো, ছয় মাস পরে ওনারা আবার আসবেন দক্ষিণ ভারত যাওয়ার জন্য। সেই মতো পিকুর সাথে ওঁদের কথাবার্তা এবং যাওয়ার প্ল্যানও ঠিক করা হয়ে যায়। আজকের দিনটা বিশ্রাম। কাল মথুরা যাওয়া হবে। রাহুল আর উমেশ এসে বললেন, পিকু জি, একটা প্রবলেম হয়ে গেছে। আপনাকে একটু ম্যানেজ করতে হবে। আমাদের বস একটা কাজ পাঠিয়েছেন, আমরা কেউ কাল যেতে পারবনা। আপনি কেয়া, রীনা বউদি আর ওনার ছেলেকে নিয়ে কাল পরশু মথুরা আর বৃন্দাবনটা ঘুরিয়ে দিন। পারলে ওখানে একটা হোটেল বুক করে নিন, একবারে ঘুরিয়ে ফিরে আসবেন। আপনি একটু কিছু করে ম্যানেজ করে নিন। আমার স্ত্রী নাহলে ভীষণ ক্ষেপে যাবে আমার উপর।" রাহুলের সাথে উমেশও বললেন, "হা ভাইয়া জি, কুছ ভি ক্যারকে ম্যানেজ কিজিয়ে..."

ধারাবাহিক উপন্যাস

পিকু কিছুটা চিন্তিত হয়ে বলল, "কিন্তু ...আমি" পিকুর কথা শেষ করার আগেই রাহুল আবার বললেন, "আরে আপনার উপর আমার ভরসা আছে, আপনি ঠিক পারবেন। আমার আসলাম তাহলে..." এই বলে তাঁরা হোটেলে চলে গেলেন।

মনে মনে কেয়ার সাথে বেশিক্ষণ গল্প করা যাবে ভেবে আনন্দিত হলেও সমস্যা হলে এখন হোটেল পাওয়া। কারণ যেকোনো হোটেলে তো এনাদের রাখা যায় না। তাই যা ভালো ব্যাবস্থা করতে হবে, তা রাতের মধ্যেই করে ফেলতে হবে। ...ক্রমশ ■

ই-সিম

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

এ জগতে সব কিছুই পরিবর্তনশীল আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দুনিয়ায় রূপান্তর বা সংস্কার-ইতো একমাত্র ধ্রুবক। যা ছিলনা, বিজ্ঞান তার জন্ম দেয় – আবার কিছুদিনের মধ্যেই সেই সৃষ্টিকে অধিকতর ফলপ্রদ বা ক্ষমতাশালী করে তোলার উদ্যোগ নেয় এই বিজ্ঞান – যাকে বলা যায় একাধারে স্রষ্টা ও পালক।

আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তা হল 'ই-সিম'। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশের মানুষই আজ 'সেলফোন' বা 'মোবাইল ফোন' ব্যবহারে অভ্যস্ত। কাজেই 'সিম কার্ড'টা কি তা আজ আর কারুর অজানা নয়। তবে অনেকেই হয়ত জানেন না যে এই 'সিম' শব্দটি তিনটি শব্দের আদ্যক্ষর দিয়ে গঠিত একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশক শব্দ অর্থাৎ 'সিম' মানে 'সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডিউল' (SIM = Subscriber Identity Module)।

'সিম কার্ড'-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ ১৯৯১ সালে, জার্মানির মিউনিক-এর 'জিৎসেক + ডিভ্রিয়েন্ট' সংস্থাটি পৃথিবীর প্রথম 'সিম কার্ড' বানায় দু'টি আকারে (in two versions)। এর একটির আকার 'ডেবিট' বা 'ক্রেডিট

কার্ড’-এর মত, অপরটি ছোট আকারের। তাদের এই উদ্ভাবনটি শুধুমাত্র দূরসংযোগের ক্ষেত্রেই নয়, বলা যেতে পারে সমস্ত ‘ইলেকট্রনিক্স’-এর জগতেই এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সূত্রপাত করে।

‘মোবাইল’ ফোনের ‘সিম কার্ড’...

‘সিম কার্ড’-এর কাজঃ শুরুর থেকেই ‘সিম কার্ড’ নিরাপদভাবে, যথাযথ পরিচিতির সাথে গ্রাহক বা ব্যবহারকারীকে সনাক্ত করে ‘মোবাইল নেটওয়ারক’এর সাথে জুড়ে আসছে। ‘মোবাইল অপারেটর’-এর দেওয়া এই ‘কার্ড’-টিই নিজের ‘মোবাইল ফোন’-এ লাগিয়ে গ্রাহকেরা অন্য গ্রাহকদের সাথে কথা বলেন বা এস.এম.এস. বা এম.এম.এস. প্রেরণ করেন – আজকাল অনেকেই এর সাহায্যে ‘ইন্টারনেট’ এর মাধ্যমে ‘ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব’-এর সাথে যুক্ত হচ্ছেন।

নিজের জায়গায় অবস্থানকালে, নতুন 'সিম কার্ড' নিতে হলে বা 'মোবাইল অপারেটর' বদলাতে হলে গ্রাহক সরাসরি 'গ্যালারি'-তে বা 'স্টোর'-এ চলে যান। কিন্তু ভাবুন তো – যদি কোন নতুন জায়গায় পৌঁছে বা যাত্রাকালে কোন কারণে কোন গ্রাহক তাঁর 'সিম কার্ড'-টি বদলাতে চান, তবে নতুন 'সিম কার্ড' না জোগাড় করে – তা কিভাবে করা সম্ভব? ঠিক এই সমস্যার সমাধানের জন্যই তৈরি করা হয়েছে 'ই-সিম' বা 'এম্বেডেড সিম' (Embedded SIM)।

'ই-সিম' তাহলে কি? খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় – 'ই-সিম' হল একপ্রকার আকারহীন (Formless or Virtual) 'সিম কার্ড' যা 'মোবাইল ফোন'-এর 'সার্কিট'-এর মধ্যেই বসান (Embedded) থাকে। এর কাজ সাধারণ 'সিম'-এর মতো হলেও, সাধারণ যে কোন 'মোবাইল ফোন' দিয়ে 'ই-সিম' ব্যবহার করা যায় না, এর জন্য চাই 'ই-সিম এনেব্লড ফোন' (e-SIM enabled phone)। এই ধরণের 'মোবাইল ফোন'-এর 'সার্কিট'-এ আগে থেকেই 'ই-সিম'-এর 'সার্কিট' যুক্ত করা থাকে – এবং ব্যবহারকারী তাঁর প্রয়োজনমতো সেটিকে দূর থেকেই চালু (Activate) করাতে পারেন।

বর্তমানে 'iPhone 12'-এর 'সিরিজ'-এর প্রায় সবকটি 'মোবাইল ফোন'-ই 'ই-সিম এনেব্লড। তা ছাড়াও 'Google Pixel 5, 4, 4a, 4 XL, 3, 3 XL, 3a, 3a XL, Huawei

Huawei P40, P40 Pro, Motorola Razr, Samsung Galaxy Fold, Note 20, Note 20 Ultra, S21 5G, S21+ 5G, এবং আরও অনেক ‘মোবাইল ফোন’, ‘ট্যাব’, ও ল্যাপটপ ও ‘ই-সিম’ ব্যবহারের উপযোগী।

বিশ্বে তথা ভারতবর্ষেও এখন বিভিন্ন ‘মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডার’-রা ‘ই-সিম সার্ভিস’ দিতে শুরু করেছেন। কভিদ ১৯ এর এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে যেভাবে এই ‘সার্ভিস’ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, তাতে মনে হয় বোধহয় আর কয়েক বছরের মধ্যেই কমদামী ‘মোবাইল ফোন’-গুলির মধ্যেও ‘ই-সিম’ বসানোর কাজ শুরু হয়ে যাবে, এবং আগামী দিনে আজকের ‘Physical SIM Card’-গুলির আর অস্তিত্ব থাকবেনা।

ব্যবহারকারীদের কি কি সুবিধা হতে চলেছেঃ প্রথমত সফরকালে প্রয়োজনমত গ্রাহকরা তাঁদের ‘মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডার’ বদল করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, ‘মোবাইল ফোন’ চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা কমবে। তৃতীয়ত, আর একটি নতুন জীবনধারা বদলানোর বীজ বা ‘ইন্টারনেট অফ থিংস’ (Internet of Things or IoT) – যা আস্তে আস্তে আমাদের জীবনের সমস্ত স্তরের বা কার্যক্ষেত্রের মধ্যে ঢুকে পড়ছে তার অন্তরভেদী যাত্রাপথকে আরও সুগম করে দেবে ‘ই-সিম’।

তাই আপনার অব্যবহৃত ‘সিম কার্ড’গুলি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করুন, না হলে পরের ‘জেনারেশন’-কে ‘সিম কার্ড’ দেখতে ‘মিউজিয়াম’-এ ছুটতে হবে। ■

বাংলার হকি নৈরাশ্যের আঁধারে ক্ষীণ আশার আলোর উঁকি

সুজন ভট্টাচার্য

'২০২১ টোকিও অলিম্পিক গেমস' আয়োজক কমিটির সভাপতি ইওশিরো মোরি সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে করোনা পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, পুনঃনির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ২৪শে জুলাই থেকে ৯ই আগস্ট টোকিওতেই গেমস হচ্ছে। তবে সর্বশেষ বৈঠক অনুসারে নির্ভরযোগ্য সুত্রের দাবি যে এ নিয়ে এখনো নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে অলিম্পিক গেমসের সম্ভাবনা নিয়ে সর্বভারতীয় হকি মহলে এক নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভাব স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ভারতীয় মহিলা হকি দলের ১৭ই জানুয়ারি থেকে আট ম্যাচের আর্জেন্টিনা সফর অলিম্পিকের প্রস্তুতিরই এক অঙ্গ বলা যেতে পারে। এদিকে বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত জাতীয় পুরুষ হকি দলের প্রস্তুতি শিবিরও শুরু হয়ে গেল ৫ই জানুয়ারী থেকে।

অলিম্পিক-প্রস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে নূতনভাবে জেগে ওঠা এই প্রাণোচ্ছ্বাসের প্রেক্ষাপটে এবং সর্বভারতীয় হকির

স্পন্দনের নিরিখে বাংলার হকির অবস্থানটা ঠিক কোথায় এবং কেমন?

একদা সর্বভারতীয় স্তরে অজস্র খেলোয়াড় উপহার দেবার সুবাদে বাংলাই ছিল জাতীয় পুরুষ হকি দলের মেরুদণ্ড এবং অহঙ্কার। কিন্তু কয়েক দশকের পর আজ জাতীয় স্তরে যোগ্যতা ও প্রদর্শনের মানদণ্ডে বাংলার হকি ঠেকে গিয়েছে একেবারে তলানিতে।

জাতীয় তথা বিশ্ব হকিকে বাংলার উপহার স্বরূপ, ঐতিহাসিক 'বেটন কাপ (Beighton Cup)' সুদীর্ঘ ১২৬ বছরের গৌরব আজও বাংলার বুকে বহন করে চলেছে। কলকাতার মাটিতে সর্বপ্রথম ১৮৯৫ সালে আয়োজিত এই 'কাপ' ভারতের প্রাচীনতম এবং বিশ্বের অন্যতম প্রাচীনতম আনুষ্ঠানিক হকি টুর্নামেন্ট।

তাছাড়া দেশকে উপহার দেওয়া আরও বহু 'প্রথম'-এর গৌরবে কলকাতা চিরকাল গৌরবান্বিত হয়ে থাকবে। ১৯০৮ সালে কলকাতায় স্থাপিত বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশন (Bengal Hockey Association বা B.H.A.) হল ভারতের সর্বপ্রথম হকি অ্যাসোসিয়েশন। আর জাতীয় স্তরের সর্বপ্রথম হকি টুর্নামেন্টও হয় কলকাতারই মাটিতে ১৯২৮ সালে। আবার ঠিক তারপরেই এই মহানগরীতেই অনুষ্ঠিত হয় সর্বভারতীয় হকি দলের প্রথম অলিম্পিক যাত্রার সূচনা।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত যে ভূমিকে জাতীয় হকির

আঁতুরঘর এবং সর্বোচ্চমানের গৌরবময় ইতিহাস বহনকারী বললেও বোধকরি বেশী বলা হয় না, সেই বাংলার হকির এমন দারিদ্র ও দুর্দশার সঠিক ব্যখ্যা কজন দিতে পারে?

রাজ্যের তথা এই দেশের বহু স্বনামধন্য হকি তারকার মন্তব্যনুযায়ী বাংলার হকির এই ক্রমে ক্রমে অধঃপতন যা আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে তার জন্য যে ক'টা প্রধান কারণ রয়েছে তাহলো – অ্যাস্ট্রো-টার্ফ যুক্ত হকির জন্য নিবেদিত মাঠ সহ কতকগুলি উপযুক্ত আধুনিক পরিকাঠামোর অভাব, স্থানীয় ক্লাবগুলির মাত্রাতিরিক্ত অনাগ্রহ এবং স্পন্সরশিপের বিশেষ অভাব, এবং তারই সাথে গড়ে ওঠা শিশু এবং কিশোর খেলোয়াড়দের অভিভাবকদের তথা সামগ্রিক সমাজের হকি বিমুখ মানসিকতা।

বাংলার হকির এই হতাশার আঁধারে এবং নৈরাশ্যের চিত্রপটে সম্প্রতি আচমকাই এক আশার ক্ষীন আলোর উঁকি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্য তথা কলকাতা মহানগরী শীঘ্রই তিন একর জমিতে অ্যাস্ট্রো-টার্ফ-সুসজ্জিত এক আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়াম পেতে চলেছে। আনুমানিক ২০.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সল্টলেক স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে নির্মিত এই স্টেডিয়াম ৬,৫০০ দর্শককে আসন দিতে সক্ষম হবে। ■

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ উশ্রী নদীর জলপ্রপাত...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ সুমন চৌধুরী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ দেশ ভক্তি...

শিল্পীঃ রূপসা পাল ✧ বয়সঃ ১৬ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

নতুন বই
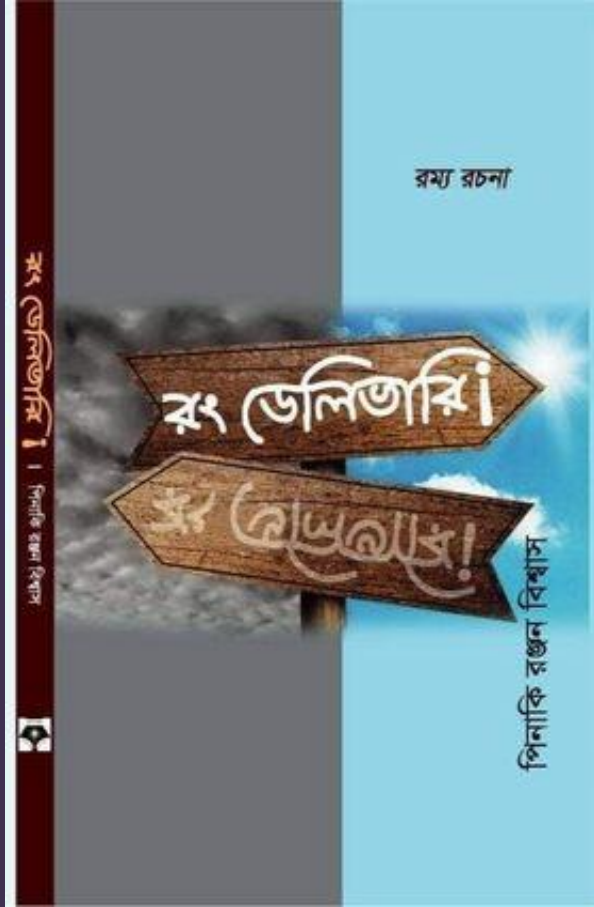
প্রতি পাতায় ভরা হাসি

যা কখনও হয়না বাসী...

সুসাহিত্যিক পিনাকি রঞ্জন বিশ্বাসের একটি অপূর্ব

রম্য রচনার সমাহার...

প্রাপ্তিস্থলঃ

https://www.rokomari.com/book/202818/rong-delivery

ভারতে শীঘ্রই আসছে...

মৌলিক

অরণ্যের দিন-রাত্রি এবং জিন্দেগি না মিলেগি দুওয়ারা

বিশ্ব প্রসূন চ্যাটার্জি

অস্কার পাবার পর একটা সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ রায় বলেছেন, 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ওনার সবচেয়ে সম্পূর্ণ সিনেমা। কলকাতার চার যুবকের জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়া, প্রেমে পড়া, শহুরে সভ্যতার থেকে নিষ্কৃতির গল্প আজও দেখতে ভালো লাগে। যদিও তার লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে সত্যজিৎ এই উপন্যাসের অনেক খুঁটিনাটি বদলেছেন, তাই সুনীলবাবু গৌতম ঘোষের পরিচালনায় 'আবার অরণ্যে' করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বলিউডের একটি সিনেমা জোয়া আখতারের 'জিন্দেগি না মিলেগি দুওয়ারা'-তে (২০১১) 'অরণ্যের দিনরাত্রি' সিনেমার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়।

যাঁরা 'জিন্দেগি না মিলেগি দুওয়ারা' দেখেছেন, তাঁরা জানেন ১৯৭১এর 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র সঙ্গে এর অদ্ভুত মিল। সেই কজন অবিবাহিত যুবক, সেই এক যাত্রাপথ, সেই একসাথে হৈ-হুল্লোর এবং প্রেম-ভালবাসা। এমন কি 'জিন্দেগি না মিলেগি দুওয়ারা'তে মেমরি গেমও আছে। যদিও 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র মতো তার ব্যাপ্তি নেই।

চলচিত্র

'জিন্দেগি না মিলেগি দুওয়ারা' এখনকার ভারতীয়দের বিদেশে ছুটি কাটানোর গল্প, বিয়ের আগে স্ট্যাগ পার্টির গল্প। 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র থেকে খানিকটা আলাদা কিন্তু দুটোই আত্ম-অনুসন্ধানের গল্প। অসীম, শেখর আর হরি যেমন ভাবে জীবনে তারা কি করবে এরপর, তেমনি ইমরান, অর্জুন, কবীরও ভাবে এই জীবন থেকে তারা কি চায়!

অবশ্যই জোয়া আখতার 'অরণ্যের দিনরাত্রি' নকল করেননি। কিন্তু আমার মতো অনেক দর্শকই এর আগে দুটো সিনেমার সাদৃশ্য নিয়ে লিখেছেন। পাঠক এবার আপনি 'জিন্দেগি না মিলেগি দুওয়ারা' দেখে বলুন 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র সঙ্গে এর কতটা মিল। আসলে সময় বদলালেও মানুষের কিছু প্রাথমিক সম্পর্কের পরিবর্তন হয় না। বন্ধুত্বর গল্প চিরকালীন। ■

জীবনের গান

সন্দীপ বাগ

টুপ করে পুকুরে একটা ঢিল পড়লে
ছোটো ছোটো বেশ কয়েকটি তরঙ্গবৃত্ত
বদ্ধ জলে নেচে নেচে ওঠে,
খানিক পরে মিলিয়েও যায়।

লাল পিঁপড়ের সংঘবদ্ধ খাদ্য অভিযান
তুমি করে দিতেই পারো এলোমেলো
খানিক পরে ছন্দে ফিরবে আবার
থামবে তারা সব কাজ শেষে।

ঝড়ে উড়ে যাওয়া বাসাটার
দুঃখ ভুলে ওই দেখো ফের কাকটা
ঝাঁটা কাঠি, লোহার তার, প্লাস্টিক সুতো জোগাড়ে
কর্ম্মময় ছন্দে ব্যস্ত,
কোকিল আবার তাকে বোকা বানাবে জেনেও।

আগুনে পোড়া বস্তির কিশোরী মেয়েটা
স্কুলের বই খাতা মেডেল ড্রেস সকাল থেকে খুঁজছে,
বন্যায় ডুবে যাওয়া পাকা ধান উদ্ধারের চেষ্টায়
সপরিবারে মাঠে নেমেছে বৃন্দাবন।

বাস্তব

চিট ফান্ডের টাকাটা উদ্ধার হবে
টোটোর লাইসেন্স বা একশো দিনের কাজে পেট ভরবে
এই আশ্বাসেই কাকের দশায় দিন কাটায় জনগণ।

আপদ বিপদের নিত্য ঢিলে
ছোটো ছোটো বেশ কয়েকটা তরঙ্গ বৃত্ত তৈরি করে চলে,
নিস্তরঙ্গ জীবন নেচে ওঠে দুঃখ ও সুখে
খানিক পরে মিলিয়েও যায়
ছন্দ ফেরে কোভিড বছর শেষে। ■

নাম দিয়েছি

অমিত কুমার সাহা

ই তো সবে ফেরা হলো ঘরে;
সারাদিনের পাট চুকলো কোনোরকমে।
দুচোখ জুড়ে এখন শুধুই
ধুলোর ভারী আস্তরণ;
পলেস্তারার মতো খসে পড়ছে।
সব ধুলো এক জায়গায় জড়ো
করতেই চিকচিক করে ওঠে
একটা দানা; সযত্নে তুলে রাখি
দানাটাকে। ওটার নাম দিয়েছি?
অভিজ্ঞতা... ■

প্রেম

প্রেম

সামিমা খাতুন

এটা নাকি প্রেমের মাস,
শুনছি কথায়, গানে,
হঠাৎ করে মাথায় ভূত,
জানব প্রেমের মানে।

কবি বলেন, প্রেম অনুভূতি,
নামভূমিকায় মন,
বিজ্ঞান মতে, প্রেম রাসায়নিক,
নাটের গুরু হরমোন।

ইতিহাস খুঁজলে পাবে,
প্রেম মানেই যুদ্ধের নিমন্ত্রণ,
ভূগোল উল্টো পথে,
বিপরীত মেরুর মিলন।

পড়লে প্রেমে মানুষ,
নাকি হাওয়ায় ভাসে,
চড়ে ভালবাসার ফানুস,
বাবুর চিন্তা প্রশ্বাসে।

সদ্য প্রাক্তন প্রেমী বলে,

রকমভেদ

প্রেম কেবল ধোঁকা,
স্বপ্ন সাজিয়ে পালায় সে,
বানিয়ে আমায় বোকা।

প্রেম কেবল নর-নারীর?
ব্যাপ্তি তার এতটুকুনই?
তবে যে শেখায় জীবে প্রেম,
প্রিয় মহাপুরুষের বাণী!

ভক্তি কি আসবে মনে,
যদি প্রেম না থাকে?
দেখনদারি হলে শুধুই,
পড়বে ফাঁকির ফাঁকে।

মায়ের প্রেম আশীর্বাদে,
ভাল থাকুক সন্তান,
মুমূর্ষু রোগীর প্রেম,
টিঁকে থাকুক প্রাণ। ■

মিও আমোরে

শীলা মুখোপাধ্যায়

"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম
জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম।"
(তুমিই আমার বিভূষণ, তুমিই আমার প্রাণ,
তুমিই আমার রত্ন)

দ্বাদশ শতাব্দীতে কবি জয়দেব লিখেছেন কত আকুতি নিয়ে! বৈষ্ণব পদাবলীর রস এখনও পর্যন্ত যাঁরা গ্রহণ করতে পেরেছেন তাঁরা জানেন পদাবলীর কবিদের প্রেমের প্রতি কি অপ্রতিরোধ্য টান, মাধুর্য, মুগ্ধতা – যেন রোমান্টিসিজমের শেষ কথা।

প্রেমে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আনুগত্যর পাশাপাশি ঈর্ষা, ইগো, অধিকারবোধও একেবারে জায়গা করে নিয়েছে। পৃথিবীতে আর কোন সম্পর্কে এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তর আছে কি?

যদি বিরহ প্রেমের একটা প্রধান অংশ হয়, তবে সেই বেদনাবিধুর আখ্যানের আমার চোখে শ্রেষ্ঠ আইকন রাধাকৃষ্ণ। আমরা কখন যেন কৃষ্ণ মথুরাবাসী হয়ে যাবার পর একাকী রাধার যন্ত্রণার শরীক হয়ে যাই। ব্রিটিশ কবি Keats যখন তাঁর প্রেমিকা Fanny Browne কে চিঠিতে লেখেন, "Love is my religion. I could die for it." সেই প্রেমে শ্রদ্ধার জায়গা সব থেকে ওপরে। কতটুকুই বা

ছিল তাঁর পার্থিব জীবন? তবু সেই বৃহত্তম যাপনে প্রেমই ছিল তাঁর প্রধান দর্শন। নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ছিল না-পাওয়া ভালবাসা। যাকে বলে unreqited love.

" রৈয়া রৈয়া চাতক ডাকে বর্ষে জলধর
না মিলে আকুল তৃষা পিয়াসে কাতর।"

প্রতীক্ষার এই কথা আমরা পাই ময়মনসিংহের গীতিকায়। এদিকে চিরজীবন স্ত্রীর প্রতীক্ষায় থেকে অতুলপ্রসাদ সেন লিখেছেন, "আমারও যে সাধ বরষার রাত কাটাই নাথের সাথে।" স্ত্রী থাকেননি ওনার সাথে।

যে প্যাশন নিয়ে প্রেমের এত গর্ব, সেই প্যাশন যতটা রোমান্টিক ততটাই ধ্বংসাত্মক তা আমরা পাই "Wuthering heights" এ (author - Emily Bronte) Catherine আর Heathcliff এর কথায়, "If all else perished, and he remained, I should still continue to be; And if all else remained, and he were annihilated, the universe would turn to a mighty stranger; I should not seem a part of it."

প্রেমে এঁদের একাত্মতা যতটা ঠিক, আবার দুজনের জন্য ততটাই ক্ষতিকারক। নাগরিক কবি সমর সেন যখন বলেন, "বিষাক্ত সাপের মত আমার রক্তে তোমাকে পাবার বাসনা।" কামনার হিসহিস শোনা যায়। প্যাশনের কোন তীব্র রঙ তাতে?

প্রেমের কোন বয়স নেই ঠিকই। শুধু বয়েসের সাথে

সাথে পাল্টে যায় তার চাওয়া-পাওযার ধরন। তাতে একে অপরের প্রতি দৃষ্টির ব্যঞ্জনার সাথে সাথে তা অনেক শান্ত, সংযত আর compromised. মেরিল স্ট্রিপ আর ক্লিনট ইস্টউডের সেই ছবির কথা মনে পড়ে – “The bridges of Madison County” কি সুনিপুণ ছবি আঁকা হয় Roseman bridge ঘিরে যখন ঘর ভাঙতে না চাওয়া Francesca তাঁর ছেলেমেয়েদের অনুরোধ করেন তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ভস্ম Roseman bridge থেকে নদীতে ছড়িয়ে দিতে যেখানে তাঁর প্রেমিক Robert এর ভস্ম আছে, আর তাঁর সন্তানরা বুঝতে পারেনা তারা তাদের মায়ের কথা রাখবে, না তাদের বাবা এবং পরিবারের সবাই যেখানে শায়িত সেখানেই মাকে রাখবে, তখন মনে হয়না ছবিটা আমাদের মনে করায় প্রেমে ধৈর্য্য একটা অন্যতম শর্ত? তাই বোধহয় Robert আর Francesca আমাদের কাছ থেকে সম্মান আর সহানুভূতি দুটোই আদায় করে নেন! দর্শকের মনে গেঁথে থাকে তাঁদের দুজনের আত্মত্যাগ। পদাবলীর প্রেমের সাথে মিশে আছে দেহজ কামনা আর রাধা যদি হন চিরবিরহের নায়িকা, তবে মীরার প্রেম প্লেটোনিক। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে যোগিনী। শান্ত, স্নিগ্ধ সেই প্রেমে মীরা সর্বস্ব ছাড়তে পারেন তাঁর আরাধ্যের জন্য।

"Ei ri Main To Prem – Diwani Mero Dard Na Jane Koy." Simone de beauvoin আর Jean Paul

ঐশ্বরিক

Sartre দুজন ইন্টেলেকচুয়াল ক্রিয়েটিভ দম্পতি 1929 থেকে 1980 এই দীর্ঘ সময় বিয়ে না করে শুধুমাত্র জীবনের পার্টনার হয়ে থেকেছেন। পড়াশোনা এবং ক্রিয়েটিভিটিকে প্রেমের বন্ধন করে জীবন কাটিয়ে গেলেন এই দুই বিদগ্ধ, সংস্কৃতিমান মানুষ।

এবারে একটু সেই গাঁয়ের বধূর কথা বলি। কে বলে দাম্পত্য একঘেয়ে, ম্যাড়ম্যাড়ে? মনটুকু ছিল বলেই না সেই কৃষাণী তার কৃষাণ স্বামীকে খেতে দেবার সময় উজাড় করে দিতে পারত! দাম্পত্যের এই যে নিত্যদিনের পারস্পরিক আঁচ, একি রোমান্টিক নয়? ও সে যতই ঝগড়ায় শুকনোলঙ্কার ঝাঁঝ থাক বা তুই বেড়াল না মুই বেড়াল মনোভাব। তবুও দুজনে অনেকটা পথ চলতে চলতে ভালবাসার যে সুতোটা তৈরি হয়, তা বড় আরামের, নির্ভরতার। একে অপরকে “টেকেন ফর গ্র্যান্টেড” না করে তুললে ইন্টারেস্টিংও বটে। আর সেই সুতোর মাঞ্জার প্রেমের সল্যুশনে প্রধান উপকরণ বোধহয় বিশ্বাস। অনেকটা Leonard Cohen এর গানের কথা (Suzanne)

"And you want to travel with her, and you want to travel blind
And you know that she will trust you
For you've touched her perfect body with your mind."

সব শেষে বলি, অনেক কিছুই তো বদলে গেছে। যুগের যা নিয়ম। কোথাও বদলে গেছে প্রেমে গিভ অ্যান্ড টেকের সংজ্ঞা। তবে প্রেম নামক পরশপাথরটি যে পায় তার কাছে একঘেয়ে বদ্ধ জীবনে দখিন হাওয়া বয়। আজও সেখানে বিশ্বাস ভঙ্গ হলে বুকের পাঁজর ভাঙার শব্দ হয়। প্রেম শাশ্বত, প্রেম আবহমান। স্থান, কাল, সমাজ, বয়স, জাতপাত সবকিছুর উর্দ্ধে, বলে-কয়ে না আসা তিরতিরে এক মধুর অনুভব।

"তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শত রূপে শত বার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।"
(রবীন্দ্রনাথের অনন্ত প্রেম থেকে) ■

সনির্বন্ধ অনুরোধ

পাঠক-পাঠিকাদের সহযোগিতায় আমরা 'গুঞ্জন'-এর দ্বিতীয় বর্ষের নবম সংখ্যা প্রকাশ করলাম। তাই আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু শুধু পড়লেইতো চলবেনা, 'গুঞ্জন'কে আপনার মনের মতো করে সাজাতে হলে, আপনার মতামত আমাদের দফতর পর্যন্ত পৌঁছনো একান্ত জরুরি। তাই অতি অবশ্যই আপনার মূল্যবান মন্তব্যগুলি লিখে আমাদের 'ই-মেল'-এ পাঠিয়ে দিন।

আমাদের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল' (contactpandulipi@gmail.com)-এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর 'পাণ্ডুলিপি' 'গ্রুপে'ত অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: এপ্রিল ২০২১ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই মার্চ, ২০২১

হৃদয়-গহীনে

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

অনন্ত কালের পথে
একবারই এসেছিল সে...
সুদূর অতীতেই চলে গেছে
নীলিমার নীল স্রোতে ভেসে।

স্মৃতির গবাক্ষের ওপারে
শুধুই অনাবিল নীরবতা...
আর অতীতের মৌনতা মাখা
এলোমেলো কিছু বার্তা।

সময় এগিয়ে চলেছে
তার ভ্রূক্ষেপহীন অনিবার ছন্দে...
সে নেই, তবু মন আজও মেতে ওঠে
তার অলখ ছোঁয়ার আনন্দে।

তখন মনে হত অভ্যাস অথবা
সচেতন মধুরিত আবেশতা...
আজ বুঝি, বিরহ বেদনার মাঝেই
জেগে ওঠে প্রেমের নিবিড়তা। ■

ভূভূভূ ভূউত
সম্পাদনা
শরণ্যা মুখোপাধ্যায়
রাজশ্রী দত্ত

অনুভবে তুমি

স্বাগতা পাঠক

"আমার খুব টেনশন হচ্ছে! জানি না আজ কি হবে? আমি পারবো তো বাবলী?" অখিলেশ ভ্রূ কুঁচকে কাঁচুমাচু মুখ করে বললো মিশিকাকে। গোলাপ চারার টবের পাশে রাখা সদ্য ফোঁটা চন্দ্রমল্লিকাগুলোর উপর হাত বুলিয়ে মিশিকা খুব শান্ত গলায় উত্তর দিলো, "নিশ্চই পারবি। এতোগুলো বছরের পরিশ্রম কি বৃথা যাবে নাকি? আমার বিশ্বাস তুই পারবি।"

— তোর কথাগুলো শুনে মনে একটা জোর পাই। তুই আমার শক্তি বাবলী।

— আচ্ছা হয়েছে। নে এবার তৈরী হয়ে নে, সময় মতো পৌঁছাতে হবে তো ইন্টারভিউ সেন্টারে। আজ ফাইনাল ইন্টারভিউ আজ কোনোভাবেই দেরি করা যাবে না।

##########

আকাশী রঙের শার্ট আর ব্ল্যাক ট্রাউজারটা পরে ট্যাক্সির ব্যাক সিট গেটের কাছে এসে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে মিশীকা বললো, "দারুন লাগছে তোকে।"

— তোর পছন্দের রং-টা পড়লাম।

— হ্যাঁ এই রং-টাতে তোকে দারুণ মানায়।

গাড়ি গতি নিয়েছে, হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে ঝড়ের বেগে।

অনুভূতি

ট্যাক্সির ব্যাক সিটে বসে মিশিকার হাত ধরে অখিলেশ বললো — আজ তোকে আমার পাশে বড্ড দরকার ছিলো বাবলী।

— হুঁ সেই জন্যই তো আজ তোর সাথে যাচ্ছি, হুতুম প্যাঁচা।

— তুই না থাকলে আমার যে কি হতো!

— কিচ্ছু হতো না, কিচ্ছু না! খিল খিল করে হেসে মিশিকা বললো।

— একদম ঠিক বলেছিস।

কথা বলতে বলতে অখিলেশ খেয়াল করলো, ট্যাক্সি ড্রাইভার লুকিং গ্লাস থেকে বিস্ময়ের চোখে ওদের দিকে তাকাচ্ছে। বিষয়টা অখিলেশকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলল। মিশিকা ব্যাপারটা বুঝে দুই হাতে অখিলেশর মুখটা ওর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, — অত ভাবিস না শুধু ভাব আজকের পর তুই একজন সরকারি কর্মচারী হবি।

চোখের কোণে একফোঁটা জল ছলকে গেলো অখিলেশের, কাঁপা কাঁপা গলায় ও বললো — হ্যাঁ রে বাবলী, আমাকে আর শুনতে হবে না, বেকার, অপদার্থ, কুলাঙ্গার এই জ্বালাময় শব্দগুলো। বাবা-মাকেও আর আত্মীয় স্বজনের সামনে মাথা নীচু করে থাকতে হবে না।

অখিলেশের মাথায় হাত বুলিয়ে মিশিকা বললো — আমি বলেছিলাম না তুই পারবি। তোকে পারতেই হবে। অখিলেশ ব্যানার্জী হেরে যেতে পারে না।

শক্ত করে মিশিকার হাতটা চেপে ধরে অখিলেশ বললো — পৃথিবীর সবাই যখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো, এমন কি

অনুভূতি

একদিন রাতে মা আমার ঘরে এসে চোখের জল ফেলে বলে গেলো, ‘আর পারছি না বাবু তুই এবার একটা কিছু ব্যাবস্থা কর, কিছু না পেলে ভ্যান চালা, মুচিগিরি কর, কিছু একটা কর। একান্নবর্তী সংসারে থেকে দিন-রাত তোর জেঠিমার খোঁটা শুনতে হচ্ছে আমাকে। তোর বাবা রিটায়ার করে গেছে দুই বছর হলো, তুই বেকার সেই নিয়ে দিনরাত আমি নিমের পাচনের মতো তোর জেঠির কথাগুলো গিলছি।’

সেদিন সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি ভেবেছিলাম গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ি। ৩২ বছর বয়েস হয়ে গেল এখনও মা বাবার উপর বোঝা হয়ে বসে আছি।

কিন্তু সেই রাতে তুই আমাকে নিজের বুকে আগলে ধরে বেঁচে ওঠার নতুন সাহস জুগিয়েছিলি। তুই না থাকলে আমি আজ শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে থাকতাম বাবলী।

############

ইন্টারভিউ থেকে বেরিয়ে পাগলের মতো অখিলেশ খুঁজে চলেছে মিশিকাকে। এই তো এই অফিসের গেটের কাছেই দাঁড়ানোর কথাছিলো ওর। আজ অখিলেশের দুই চোখে শুধু খুশি আর সাফল্যের দীপ্তি। দূরে দাঁড়িয়ে সবটা দেখছে মিশিকা।

— চল আজ বিকেল থেকে পুরো সন্ধ্যেটা আমরা কলকাতার রাস্তায় হাঁটবো। কথাটা বলে অখিলেশের পিঠে হাত রাখলো মিশিকা।

— আমার ইন্টারভিউ খুব ভালো হয়েছে বাবলী, চাকরিটা কনফার্মড। মিশিকাকে দুহাতে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলো

অনুভূতি

অখিলেশ।

— আমি জানি!

— গঙ্গার ধারে যাবি?

— সেটা আর বলতে। যাবোই তো।

####################

৪.১.২০২১, সকাল ১০.৪০...

কাল সারা রাত মিশিকার কোলে মাথা রেখে গল্প করেছে অখিলেশ তাই সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে। সকাল সকাল মা বকবক করতে করতে এক কাপ চা রেখে গেছে ওর ঘরে।

— নবাব পুত্তুর এখনও ওনার ঘুম থেকে ওঠার সময় হলো না। চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেলো যে... দক্ষিণের জানলা থেকে মিঠে রোদ এসে পড়ছে বিছানায়। আলসেমি ভেঙে হাতে ফোনটা নিয়ে অখিলেশ চমকে উঠলো। আজ ৪ঠা জানুয়ারি মিশিকার জন্মদিন। ইসস কাল রাতে ওকে উইশ করা হয়নি। আজ সকালেও এতো বেলা হলো।

— নিশ্চই খুব রেগে আছে মিশিকা, সেটাই স্বাভাবিক। নিজের মনেই বলে উঠলো অখিলেশ। বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এদিক-সেদিক দেখলো অখিলেশ। ব্যালকনি, ছাদ না কোথাও নেই বাবলী। কোনো রকমে ঠান্ডা চা গলায় ঢেলে, বাথরুমে ঢুকলো সে। মিনিট পনেরোর মধ্যে ফ্রেশ হয়ে সে বেরিয়ে গেলো সাইকেলটা নিয়ে। বাজার থেকে একগোছা লাল গোলাপ আর একটা সাদা চন্দ্রমল্লিকা কিনে নিয়ে আসলো। এই লাল

অনুভূতি

গোলাপ পেলেই রাগ ভাঙবে ম্যাডামের। বাড়ি ফেরার পথেই ঠিক গেটের কাছে আসতেই একটা ডাকে থমকে দাঁড়ালো অখিলেশ।

বরুণদা, মানে পোস্টমাস্টার দাদা। বিগত চার বছরে এই পাড়াতে বলতে গেলে শুধু মাত্র অখিলেশের চিঠিই দিয়েছে বরুণদা। সব ইন্টারভিউ কল লেটার। খুব ভালো একটা দাদা ভাইয়ের সম্পর্ক হয়ে উঠেছে ওর অখিলেশের সাথে। হাসি মুখে এগিয়ে এসে বরুণ অখিলেশের হাতে একটা লেটার দিয়ে বললো — মিষ্টিটা কবে পাচ্ছি ভাই?

অখিলেশের বুকের ভেতরে তখন তোলপাড়। জলভরা চোখে সে বরুণ পোস্টমাস্টারের দিকে তাকালো। বরুণদা ওর কাঁধে স্নেহের হাত রেখে বলল — হ্যাঁ ভাই হয়েছে তোমার। ঠিক এই রকম আবেগে আমারও বুকটা কেঁপে উঠেছিলো যখন আমি প্রথম লেটারটা পেয়েছিলাম।

বাড়িতে ঢুকেই দৌড়ে উপরে নিজের ঘরে গেলো অখিলেশ দরজা বন্ধ করে টেবিলের উপর রাখলো লাল গোলাপ আর চন্দ্রমল্লিকা। তার পাশেই রাখলো এতো দিনের উপেক্ষা, অপামান, অপেক্ষা আর পরিশ্রমের একটা জীবন্ত উত্তর, খাম বন্দি চাকরির জয়েনিং লেটার। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো মিশিকার সামনে। দুইচোখে তখন জলেরধারা। কাঁপা কাঁপা গলায় বললো — আমি পেরেছি! বাবলী আমি পেরেছি! তোর এই অপদার্থ প্রেমিকটা পেরেছে নিজেকে প্রমাণ করতে। দেওয়ালে ঝোলানো ৮ বাই ১২ এর ফটো ফ্রেম থেকে মুখ ভরা হাসি আর চোখ ভরা অসম্পূর্ণ প্রেমের গল্প নিয়ে তাকিয়ে

আছে মিশিকা চ্যাটার্জী। চোখের জল মুছে মাথা তুলে তার বাবলীর ছবির দিকে তাকিয়ে অখিলেশ বললো, — হ্যাপি বার্থ ডে বাবলী। হ্যাপি বার্থ ডে।

হঠাৎ পেছন থেকে মিশিকা বলে উঠলো — শুধু লাল গোলাপ দিয়ে উইশ করলে হবে না। আজ কিন্তু সারাদিন বাইরে কাটাবো। পুরো কলকাতা চষে ফেলবো। সকাল সকাল এতো ভালো একটা খবর পেলাম। ব্যালকনিতে গোলাপ চারার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললো মিশিকা।

অখিলেশ দৌড়ে গিয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো — কোথায় ছিলি তুই? সকাল থেকে তোকে না দেখতে পেয়ে আমার কেমন লাগছিলো জানিস। কোথায় ছিলি, বল? এইভাবে আমাকে ছেড়ে যাস না তুই। আমি পাগল হয়ে যাবো।

অখিলেশের কলাপে আলতো চুমু খেয়ে ওকে শান্ত করে, ওর জলে ভেজা চোখের দিকে তাকিয়ে মিশিকা বললো — আমি সবসময়, সবজায়গায়, প্রতি মুহূর্তে তোর সাথে আছি। আমি আছি তোর মনে, আমি আছি তোর চিন্তায়, আমি আছি তোর অনুভবে... ■

প্রেমের ভূ-স্বর্গ লসএঞ্জেলস্

হাজেরা বেগম (আমেরিকা)

আমি যাবো দেশ বিদেশে
দেখতে নিউইয়র্ক, লসএঞ্জেলস্
কিংবা হলিউডে
নায়িকারা কেমন করে হাসে
বাতাসে চুল দুলিয়ে কেমন করে নাচে।
দু'হাত পা ছুঁড়ে কিচির-মিচির পাখির মত
উল্লাসে আকাশে উড়ে
চিকন-চিকন জিরো ফিগারে
চোখ জুড়ানো মিনি স্কার্ট পড়ে।
পেন্সিল হিলে টুকটুক মধুর ছন্দে
বকের মতো হাঁটে
মন মাতানো গানের তালে
বয়ফ্রেন্ডের গলা জড়িয়ে চুক করে
একটা kiss মারে।
সাথে কাজল কালো আঁখিতে
ভ্রূ নাচিয়ে প্রশ্ন করে
Hello dear? How you feels??
সশব্দে খুশির বন্যা বইয়ে পুরো

প্রেমবিলাসী

হলিউড মাতিয়ে তোলে।
এ যেন এক পবিত্র প্রেমের ভূ-স্বর্গ
হলিউড এমনই আনন্দের
বন্যায় সবাই দোলে।
সবাই আপন ভুবনে নিজ নিজ
খুশিতে মাতোয়ারা হয়ে মাতে
প্রেমের ভূ-স্বর্গ, নায়ক নায়িকাদের
হলিউড লসএঞ্জেলস্। ■

ভ্যালেন্টাইনে ভ্যাবলাগিরি

অনিমেষ ভট্টাচার্য

তখন বসন্তকালে শুকনো গাছেরা পাতার আদরে সেজে উঠতো। পলাশফুলের লালে চোখটা আটকে যেত। আমরা হার্কিউলিস সাইকেলে চড়ে ঝাঁক বেঁধে স্কুলে স্কুলে নেমন্তন্নটা সেরে ফেলতাম। অমুক তারিখে অমুখ সময়ে আমাদের স্কুলে পলাশপ্রিয়ার আরাধনা হবে। অতএব মহাশয়, মহাশয়ারা আসবেন। নির্ভয়ে আপনার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠাবেন। অঞ্জলির সময় সকাল দশ ঘটিকা। খুব উৎসাহ মনে... যদি আসে...

কিন্তু যে টেলিফোন আসার কথা... সে টেলিফোন সচরাচর যেমন আসে না... নিমন্ত্রিত অতিথি বা বিশেষ করে সেই সব অতিথিনীরা আসতেন না। শুধু সকালের মেয়েরা শাড়ি পড়ে বেণী দুলিয়ে আসত। আমরাও সাদা পাঞ্জাবী পায়জামা পড়ে (তখন এতো কালারফুল পাঞ্জাবীর চল ছিলো না) সিঁড়ির মুখে দাঁড়াতাম। ডবল বেণীরা যদি একবার তাকায়! এন্ড্রয়েড ফোন তো ছিলো না। তাই সেল্ফি টেলফিরও চল ছিলো না। হোয়াটসআপে পিং করাও জানতাম না। শুধু নতুন ওঠা আলুর মতো গোলগোল চোখ করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না।

অনেকে পাড়ার পুজোয় থাকতে হবে অজুহাতে কেটে যেত। পরে জানা যেত তাদের পাড়ার পুজোয় সেবার চাঁপাডাঙ্গা থেকে ফুলটুসি এসেছিল। ফুলটুসি হলো ফুলবৌদির ফুলভাইয়ের মেয়ে, তখন তার নবম শ্রেণী।

কিন্তু পরেরদিন ফুলটুসিও ফিরত। যেন ম্যাড়ম্যাড়ে বঙ্গলিপি খাতায় সুলেখা কালিতে লেখা... এট্টু জল পড়লেই সব কেমন যেন আবছা হয়ে যেত। আর পি ভি আর ও ছিল না... যে সেখানে পপকর্ন আর মকটেল খেয়ে যে দুঃখ ভুলবো। কাজেই ভাসানের পর ফিরে এসে আমরা লুচি তরকারি খেতাম। অমলতাস গাছটায় একটা কোকিলের আড্ডা ছিলো। আমাদের দুয়ো দিয়ে দুষ্টুটা কুহু কুহু ডেকে উঠতো । ■

পিকনিক

অশোক সামন্ত

সারাদিন কাজ নেই
চিন্তার খোঁজ নেই
তুমি আমি একসাথে
পিকনিকে জোড়া হাতে।

কত খেলা কত গেম
কত খাওয়া কত প্রেম
বছরে আসে এ দিন
অনুভবে রোজ দিন।

সময়ের দাম নেই
উড়ে চলে মনটা
কার পাতে কি যে পড়ে
কার কোন গুনটা।

হাওয়া দোলে নিজে দোলে
মন দোলে সব ভুলে
ভাব করি আড়ি করি
তবু যেন পুড়ে মরি।

বড়ো বড়ো চোখ করে

হাসির ফোয়ারা

দেখো তুমি মন ভরে
কথাহীন ইশারায়
স্পন্দন বয়ে যায়।

এই নিয়ে পিকনিক
হয় যদি রোজ হোক
কাজ ছাড়া দেখবে
তোমাদের আমি লোক। ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

আকাশ প্রদীপ

ডঃ মালা মুখার্জী

ঘন নিকষ কালো অন্ধকার, দুরের পাহাড়গুলো অন্ধকারে মিশে আছে। আশেপাশের ঘরে এল.ই.ডি. বাল্বের রঙিন আলো জ্বলছে, পুরো শহরটা আলোর মালায় সেজেছে। সেই আলোর রেখাতেই সূর্য্যাস্তের পরও দূরের পাহাড়ের রেখা দেখা যাচ্ছে ।

রেবা ছাদে উঠেছে অন্য কোনো কারণে নয়, আকাশপ্রদীপ জ্বালানোর জন্য। এখানে আকাশ প্রদীপ পাওয়া যায় না, বানাতে হয়েছে। বাংলার বাইরে বোধহয় আকাশপ্রদীপের কনসেপ্ট নেই, এখানে কার্ত্তিকমাস দিওয়ালীর মাস। দিওয়ালীর আগে-পরে সব বাড়িতেই এমন আলোর বাহার। রেবা দিওয়ালী বাদ দিয়ে অন্য কোনোদিনই মিনিয়েচার লাইটগুলো জ্বালায় না, বরং বাঁশের ডগায় এই প্রদীপ জ্বালিয়ে কাপড় দিয়ে ফানুসের মতো ঘিরে রাখে। লাল কাপড়ে প্রদীপের শিখা লালচে লাগে।

রেবার ছোটবেলায় বাবা বলতেন, পুরো কার্ত্তিকমাস এই প্রদীপ জ্বালাতে হয়, স্বর্গত পূর্বপুরুষদের জন্য আর বৈকুণ্ঠাধিপতি লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশ্যে। এই প্রদীপ জ্বালানোর পর বাবা একটা মন্ত্র বলতেন, রেবা মন্ত্রটা বলল।

চিরন্তন

এত বছর ধরে রেবা কার জন্য আলো জ্বালায়? ওর বাবা-মায়ের জন্য? স্বর্গত পূর্বপুরুষদের জন্য, না কি তার জন্য, যার জন্য আজও রেবা মনে মনে অপেক্ষা করছে, কিন্তু, তার মন জানে সে কখনোই ফিরবে না। এই নিজে হাতে বানানো প্রদীপটা ও সারাবছর ধরে জ্বালে। উত্তুরে হাওয়ায় কি প্রদীপটা নিভে যাবে? না, না, রেবা বসে থাকবে, প্রদীপটা নিভে গেলে মুশকিল।

ঠাণ্ডা হাওয়া চলছে, রেবা শালটা জড়িয়ে নিল। জব্বলপুরে এমনিতেই হেমন্তমাসে ঠাণ্ডা পড়ে যায়। রেবা অবশ্য এই অল্প ঠাণ্ডাটা উপভোগ করে। কিন্তু বেশীক্ষণ বসার আগেই মিত্রামাসীর গলা পেল রেবা, "রেবা, নীচে আয়। খাবি না?"

এই ডাক উপেক্ষা করার উপায় নেই, মিত্রামাসীই এই পরিবারের অলিখিত অভিভাবিকা। রেবা নীচে এলো, মাসী গরম চা আর স্যাণ্ডউইচ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, "স্কুল থেকে কখন এসেছিস, খাবি না?"

সত্যি, মিত্রামাসী এত খেয়াল রাখেন, মায়ের অভাবটা যেন বুঝতেই দেন না! কে বলবে রক্তের সম্পর্ক নেই! অবশ্য এই মুহুর্তে মিত্রামাসী ছাড়া পুরো জব্বলপুর শহরে রেবার আছেটাই বা কে? বাবা এই শহরে কাজ করতেন, দোর্দণ্ডপ্রতাপ উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক ছিলেন। মধ্যভারতের এই শহরটাকে বাবা এতই ভালোবেসে

ফেলেছিলেন যে এখানেই বাড়ি বানিয়েছেন, রেবাও এখানেই জন্মেছে। নর্মদার আর এক নাম রেবা, মেয়েরও তাই নাম। কিন্তু এই মুহূর্তে এই দুতলা বাড়ি, বাগান সব গিলে খেতে আসে। ভাগ্যিস স্কুলে চাকরিটা ছিল!

"শোন, একটা ভালো সম্বন্ধ পেয়েছি," মিত্রামাসী স্যালাড সাজাতে সাজাতে বললেন, "তুই বললেই কথা বলবো। এখানকারই ছেলে, তোর সাথে এবাড়ীতেই থাকবে..." রেবা হাসলো। "মেয়েদের বিয়ে করতেই হয়, তাই না, মাসী?"

"শোনো কথা," মিত্রা হাসলেন, "বয়স তো পঁয়ত্রিশ পেরোলো মা, অনিমেষদা হঠাৎ চলে না গেলে আবার নিশ্চয় চেষ্টা করতেন, তাই না? আমি না হয় তোমাদের কেউ নই, কিন্তু..."

"মাসী, প্লিজ অমন বোলো না," রেবা বলল, "আমি আর সম্পর্কে জড়াতে চাই না।"

"তা বললে হবে কেন?"

রেবা বুঝলো মাসী কোনো কথাই শুনবেন না। আজ থেকে দশ বছর আগেই বাবা চেষ্টা করেছিলেন বিয়ের। সুন্দরী রেবা অনেকেরই হার্টথ্রব ছিল, কিন্তু কুন্দন একেবারে অন্যরকম ছিল। কুন্দন গরীব ঘরের ছেলে, প্রচুর স্ট্রাগল করে লেখাপড়া চালাতো। রেবার সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাবা প্রথমটা মেনে না নিলেও, মা মানিয়েছিলেন। কুন্দন মেধাবী, এক চান্সে ইউ.পি.এস.সি. ক্লিয়ার করেছিল,

আই.পি.এস. নিয়েছিল। সেদিন রেবা ভেবেছিল খুব শিগগিরি ও বিয়ের পিঁড়িতে বসবে, কিন্তু কপাল মন্দ। ট্রেনিংয়ের সময়ে দুর্ঘটনায় মারা যায় কুন্দন। রেবা মেনে নিতে পারেনি, সুইসাইড করতে গিয়েছিল হাতের শিরা কেটে। ওকে বাঁচানো গেলেও, মনের ডিপ্রেসনটা গ্রাস করে নিয়েছিল পুরোপুরি। তখন হয়তো ডঃ অগ্নিমিত্রা রয় না থাকলে রেবা ঘুরে দাঁড়াতে পারতো না।

বাবা শোনেননি কোনো কথা। রেবা বলেছিল, “কুন্দনের স্মৃতি নিয়েই বাঁচতে চাই।” বাবা শোনেননি। কাগজ দেখেই কলকাতায় সম্বন্ধ করেছিলেন। বিয়ের দু’দিন আগে পাত্রপক্ষ অজানা কারণে বিয়েটা ভেঙ্গে দিয়েছিল। বাবা এটা মেনে নিতে পারেননি। হার্ট অ্যাটাকে চলে গেলেন।

“আমি তো সব জানি রে, মা,” মিত্রামাসী বললেন, “তুই সারা বছর ধরে আকাশপ্রদীপ জ্বালাস কুন্দনের নামে, তাই না?”

– এত কিছু জেনেও কেন বিয়ের কথা তোলো? রেবা স্যাণ্ডউইচ খেয়ে উঠে পড়লো।

– তুই রাজি হয়েই তো দেখ, হয়তো সেও কুন্দনের মতোই হবে। হয়তো তোর কুন্দনই ফিরে এল...

রেবা হেসে উঠল, অপ্রকৃতিস্থ সেই হাসি। “মৃতব্যক্তি ফিরে আসে না, মাসী। কুন্দন মৃত, ও আর আসবে না, শুধুমাত্র আকাশপ্রদীপের আলোই পারে রাতের অন্ধকারে ওকে

ফেরাতে...” রেবার গলার স্বরটা হাহাকারের মতো শোনালো।

রেবাকে আবার ছাদে যেতে হবে। আকাশপ্রদীপ যখন জ্বলে তখন নাকি মৃত আত্মারা পৃথিবী হতে স্বর্গে ফিরে যায়। আর কিছুক্ষণ জেগে থাকলে রাত গভীর হবে, হয়তো কুন্দনও সেই শেষরাতে ফিরে আসবে। রেবা আজও অপেক্ষা করে। মিত্রামাসী বাঁধা দেন না। তিনিও জানেন কুন্দন আসবেই।

রাত নামে, আকাশপ্রদীপ ক্রমশ নিভে আসে। রেবা আকাশপ্রদীপের নীচে ছাদের আলসেতে হেলান দিলো। রাতটুকুই রেবার প্রিয়, সে আসবে! রেবা চোখ বুঝলো। মধ্যরাতে যখন রেবা ছাদে আকাশপ্রদীপ আগলে বসে আছে, তখন বাড়ির সামনে অফিসার কুন্দন সিংয়ের গাড়িটা থামলো। মিত্রামাসী দরজা খুলে দিলেন, কুন্দন মিত্রামাসীকে দেখে অপ্রস্তুত মুখে বললেন, “আজ লেট হয়ে গেল, সরি। ম্যাডাম, ড্রাইভার আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে...”

“ঠিক আছে, আমি এতদিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, কুন্দন,” মিত্রামাসী হাসলেন, “ছাদে যাও, মেয়েটা কখন থেকে আকাশপ্রদীপ জ্বালিয়ে বসে আছে। আমি সত্যিই এত বছরের প্রফেশনাল লাইফে এমন গভীর প্রেম দেখিনি।”

“আমি ওর চোখে মৃত,” কুন্দন দীর্ঘশ্বাস ফেলল, রেবার বাবা যদি সম্পর্কটা মন থেকে মেনে নিতেন, তাহলে এইসব কিছুই হতো না। অত্যন্ত সাধারণ ঘরের ছেলে কুন্দন, পুলিশ

ট্রেনিংয়ের সময় হায়দ্রাবাদে থাকাকালীন সময়ে অনিমেষবাবু মিথ্যে খবর রটিয়েছিলেন কুন্দনের মৃত্যু নিয়ে, যাতে মেয়ে কুন্দনকে ভুলে গিয়ে বিয়ে করে তাঁর পছন্দের পাত্রকে। কিন্তু তা হয়নি।

রেবা আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে বিয়ের দু'দিন আগে। সে প্রাণে বাঁচলেও মানসিক ভারসাম্য খুইয়ে ফেলে। জীবন্মৃতের মতো বেঁচে থাকা মেয়ের অবস্থা জানিয়ে অনিমেষবাবু যখন কুন্দনকে খবর পাঠান, ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। অনিমেষবাবুর কোনো চেষ্টাতেই রেবা বিশ্বাস করেনি যে কুন্দন বেঁচে আছে, তবুও কুন্দনকেই মেয়ের দায়িত্ব দিয়ে যান অনিমেষবাবু।

বাবার বলা মিথ্যেটা রেবার জীবনের ধ্রুবসত্য হয়ে গেছে। ডঃ অগ্নিমিত্রার চিকিৎসায়ও সাড়া দেয়নি রেবা। মিত্রামাসী বছর দশেক ধরে চেষ্টা করছেন কুন্দন আর রেবাকে এক করতে, রোজই কথা পাড়েন, কিন্তু, দিনের আলোয় কুন্দনকে দেখলে চিনতে পারে না রেবা, সহ্য করতে পারে না অন্য কোনো পুরুষকেও। দিনের বেলা নিজেকে ঘরে বন্দী করে রেখে রেবার মনটা দশ বছর পিছিয়ে যায়, যখন ও একটা স্কুলে পড়াতো! আবার বিকেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোজা চলে যায় ছাদে, নিজে হাতে বানায় আকাশপ্রদীপ। মনে মনে ভাবে রেবা, এই প্রদীপের আলো ধরে কুন্দন ফিরবে ওর কাছে, শুধুই রাতটুকুর জন্য।

চিরন্তন

অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে কুন্দন ওপরে উঠে গেল। আধা ঘুমন্ত-আধা জাগন্ত রেবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। “তুমি এলে?” রেবা অস্ফুট কন্ঠে বলল, “ওই আকাশপ্রদীপটা তোমায় বাড়িটা খুঁজতে সাহায্য করলো?”

“হ্যাঁ, তাই তো ওটা নিভে গেছে, আমার যে ফেরার দরকার নেই...” গাঢ় অন্ধকারে কুন্দনের কণ্ঠস্বর ডুবে গেল।■

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ পেঁচা...

শিল্পীঃ রূপসা পাল ✧ বয়সঃ ১৬ বছর

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ আবির্ভাব...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

অহংকার

আবদুল বাতেন (আমেরিকা)

বুকে বন্দুক ঠেকে ধরলেও ভালোবেসো
ভালোবেসে যাও।
ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে দৃঢ়
মাইনের উপর রেখে দু'পা
নির্দ্বিধায়, নিঃস্বার্থ
ভালোবেসো, ভালোবেসে যাও।

শিয়রের 'পরের ছাদ এবং
পদতলের মাটি গ্যালেও উড়ে
লক্ষ কীটের কামড়ে আঁচড়
ছোবলের সামনে, গোখরোর
প্রতিক্ষণে, প্রিয়জন
ভালোবেসো, ভালোবেসে যাও।

কফ থুতু বমির বানেও
অনন্ত অনুরাগ তোমার অক্সিজেন।
নয়নতারা নিভে যায় যদি
আর না নড়ে ঠোঁট হাত-পা
কোন কৌশলে, হৃদস্পন্দন
যতক্ষণ ঢিপঢিপ, ভালোবেসো। ভালোবেসে যাও...
এক জনমে ভালোবাসা ছাড়া
মানুষের কি আছে অহংকারের আর? ■
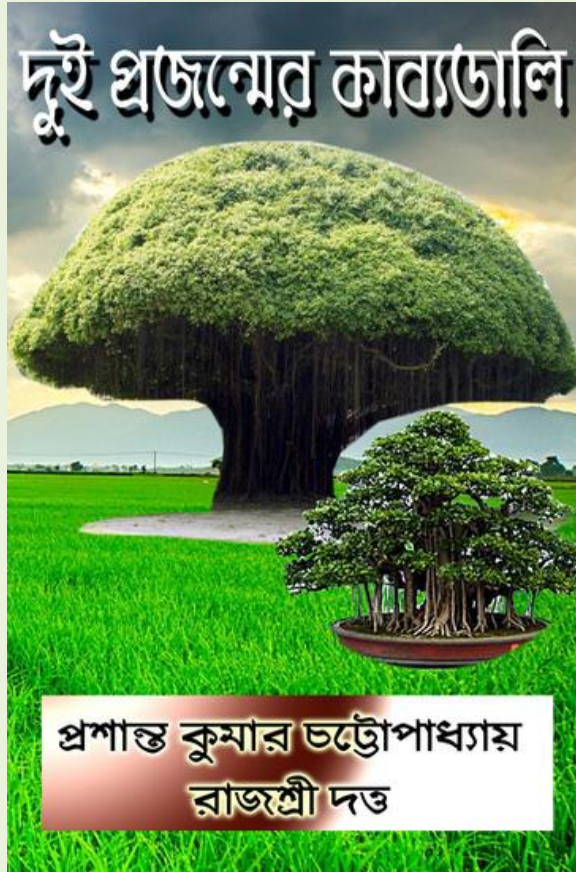
দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

দিশেহারা

প্রণব কুমার বসু

উঠতি বয়স থেকেই আমার মনে কীভাবে জানিনা একটা অনুভূতি তৈরি হয়েছিল — ছেলেরা প্রেম করতে গেলে মেয়েদের কাছে মাথা নত করতে হয়! কেন যে এই ধারণা বাসা বেঁধেছিল মনের মধ্যে সেটা জানা নেই। তবে হয়তো পারিপার্শ্বিক কয়েকটা ঘটনার প্রভাব পড়েছিল মনে!

খুব ছোটবেলার এক বন্ধু শ্যাম, একসঙ্গে ওঠাবসা খেলাধুলা সবই করতাম। যদিও স্কুল ও ক্লাস আলাদা। আর আমাদের সময় আমরা সবধরনের খেলাধুলা করতাম। ফুটবলের সময় ফুটবল, ক্রিকেটের সময় ক্রিকেট — এমনকি হকি খেলাটাও বাদ যায়নি।

তারেকের এক দাদা ফার্স্ট ডিভিশনে ফুটবল খেলতো। যেদিন উনি আমাদের একটু আধটু খেলা শেখাতেন — মনে হতো হাতে স্বর্গ পেয়ে গেছি। আর এক বন্ধুর দাদার ক্রিকেট ব্যাট আর পুরনো কর্কেট বল, এক পায়ের প্যাড —এগুলো ছিল প্রথম প্রেম !

শ্যামের দিদি অন্য পাড়ার একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করতো – এটা প্রথম শুনেছিলাম আর এক বন্ধু পুটুর মুখ

থেকে। কারণ পুটু নাকি সিনেমা দেখার লোভে ওদের দুজনের পিয়নের কাজ করতো! সেই প্রেম যদিও ভেঙ্গে যায় — শ্যামের দিদির বিয়ে হয় অন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে...

এরপর যখন কলকাতার মাঠে খেলি তখন ম্যাচ দেখতে কোনও এক কর্মকর্তা তার মেয়েকে নিয়ে এসে আলাপ করাতে আসলে টেন্টের অন্য প্রান্তে চলে যেতাম — কী কারণে সেটা আজও বুঝিনা!

কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে কাজ করার সময় হঠাৎ কী থেকে যেন কী হয়ে গেল। আমি প্রিভেন্টিভ ডিপার্টমেন্টে আর মেয়েটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টে। দিনে দু-চারবার কী সব কাজ নিয়ে আসে। এরপর কয়েকদিন গঙ্গার ঘাটে বসে চিনেবাদাম খাওয়া, শেষদিনে শুনলাম — বিধবা মায়ের আপত্তি, তাই দু-নৌকায় পা দিয়ে তো চলা যায়না...

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি ছেড়ে বেশি অর্থ উপার্জনের আশায় মাল্টিন্যাশনাল ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করতে অবিভক্ত বিহারের নানান জায়গায় শুরু হল ঘোরাঘুরি — কোথাও ডাক্তারের কন্যা, কোথাও প্রফেশনাল বন্ধুর শালি...

না আমার দ্বারা প্রেম আর করা হয়ে ওঠেনি, বা হয়তো সুযোগ পাইনি, এক হাঁটু মুড়ে বসে কাউকে গোলাপ ফুল ধরানোর! অবশ্য নিরাশ হইনি — প্রচেষ্টা চলছে... ■

প্রেম

শুভা লাহিড়ী

আসতে যেতে রাস্তা পথে দেখতে তোকে পেলাম
ক্ষণিক পরিচয়ে আমি প্রেমে পড়ে গেলাম।
নামটি তোর তিস্তা নাকি বললো সবাই মোরে
মনে মনে তোকে আমি নিলাম বাহুডোরে।
তোর বুকেরই মাঝের আমি উচ্ছ্বলতা দেখে
ডুব যে দিলাম জলের মাঝে সব কিছুকে রেখে।

আমায় পেয়ে তুইও আমায় জড়িয়ে বুকে নিলি
এক নিমেষেই অনেক কথা আমায় বলে দিলি।
তোর মনেতেও দুঃখ এত ভাবছি আজও বসে
মিলছে না তো অঙ্ক আমার হাজার হিসেব কষে।
জিজ্ঞাসিতেই বললি আমায় থাক না ওসব কথা
আমার কথা শুনে ব্যথা পাস না এত বৃথা।

বরং আমায় একটি কথা আজকে দিবি বল?
এই ভাবেতেই বাসবি ভালো করবি না তো ছল?
মানুষ নাকি খুবই ভালো ছলনাটা জানে
তুই আমাকে বাসলি ভালো কিসের এত টানে!
দুই দিনেরই পরিচয়ে তুই বড্ড আপন হলি
আমায় ফেলে গেলেও চলে, যাবি না বল ভুলি।

প্রণয়

বাড়ি এসে ভাবছি তোর একটি কথাই শুধু
নদীরও এমন প্রাণটা কাঁদে, মনটা করে ধূ ধূ।
জীব বা জড় সবার বুঝি সুপ্ত থাকে মন
দুঃখ হলে অলক্ষেতে ওরাও কাঁদে সারাক্ষণ।
আমরা তাদের জড় ভেবে করি কতই অনাচার
ময়লা আবর্জনা ফেলে করি স্তুপাকার।। ■

শুধু ভালোবাসা

শুভ্র নাগ

তুমি সত্য।
তাই তুমি সুন্দর।
তুমি সত্য ও সুন্দরে আবৃত বলেই
শিব অধিষ্ঠিত তোমার হৃদয়ে।

তুমি আদিহীন।
অন্তও নেই যে তোমার।
তুমি আদি ও অন্তহীন বলেই
যুগ থেকে যুগে, কাল থেকে কালে তোমার।

তুমি বাস্তব।
কখনও বা কল্পনাই শুধু।
বাস্তব আর কল্পনা তোমাতে মিশেছে বলেই
তুমি এতো অপূর্ব।

তুমি এক অঙ্গীকার।
বিশ্বাসের পটভূমিতে আঁকা তোমার রূপ।
অঙ্গীকার আর বিশ্বাসের যুগল সম্মিলনে
তুমি জাগ্রত করো চেতনা — তৈরি করো অহংকার।

তুমি এক নাম।
কিন্তু অর্থ তোমাতে প্রচুর।
তুমি একনামী অথচ বহু অর্থপূর্ণ বলেই
তুমি ‘ভালোবাসা’ — শুধু ভালোবাসা। ■

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ (ওপরে) সূর্যোদয়..., (নীচে) ঠাকুরের পাঠ শালা...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রগুলি কেমন লাগল...

পথিকের প্রেম

অনন্যা দাস

পথে পথ ধরি, বহু দেশ ঘুরি;
কোথা গেছে ছাড়ি, মায়াবী ঐ নারী।
বেঁধে রাখি তারে, বুকেরো মাঝারে;
খুঁজি বারে বারে, জীবনের তরে।

মিলে নাই দেখা, তবু ঘুরি একা;
ভ্রমি প্রাণো সখা, যদি মিলে দেখা।
গগনের পানে, ছুটে আসা গানে;
মা মাটিরো টানে, কাঁদে মন জানে।

তবু ঘুরি দেশে, পথিকেরো বেশে;
দেখা অবশেষে, সজ্জিত ঐ কেশে।
পথো চেয়ে নারী, লাল পেড়ে শাড়ি;
আশা শুধু তারি, দেবো মোরা পাড়ি।

যেথা যাবে আঁখি, হাতে হাত রাখি;
বৃথা স্বপ্ন দেখি, তবু আশা রাখি। ■

পত্রের আড়ালে

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

নীলাঞ্জনা,

তোমার চিঠি পেয়েছি। শুরুতেই সেই এক অভিযোগ, চিঠির সম্বোধন আর শেষ করতে শিখলাম না। নাই বলতে পার। যারা প্রেম পত্র লেখে তাদের আদিখ্যেতা থাকে, আমি তো তোমায় প্রেম পত্র লিখি না, তাই হয়তো শুরু আর শেষটা ন্যাড়া থেকে যায়। থাক সে কথা।

লিখেছ স্মৃতি নিয়ে লিখতে। দেখ, কারো কাছে "স্মৃতি সততই সুখের" আবার কারো কাছে "শুধুই বেদনার।" এ লেখা সুখের নাকি বেদনার তার বিচারক একমাত্র তুমি।

স্কুল ফাইনাল পাশ করে তুমি আমাদের কলেজে ক্লাস ইলেভেনে এসে ভর্তি হলে – আমি তখন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। সহপাঠী একজন এসে একদিন খবর দিল, "যা একটা মাল এসেছে না..." খেয়াল করলাম সহপাঠীনিদের মুখ টিপে হাসি। "মাল" শব্দটা বড় বেশি কানে লেগেছিল, কোন প্রতিবাদ বা উত্তর না দিয়ে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়েছিলাম। খেয়াল করছিলাম কলেজের সহপাঠী থেকে উঁচু ক্লাসের দাদাদের মধ্যে কি একটা বিষয় নিয়ে সব সময়

চিঠি

কেমন যেন একটা ফিসফিসানি। দেখতে দেখতে আমি তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করলাম, তুমি বারো ক্লাসে।

একদিন কলেজের ক্যান্টিনে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে খেয়াল করলাম দুটো টেবিল পরে নীচু ক্লাসের কয়েটি ছেলে মেয়ে একসাথে গল্প করছে। তার মাঝে একজন যেন সবার থেকে আলদা। দুধে আলতা গায়ের রং হয় শুনেছিলাম, তবে চোখে তখনও দেখিনি। মাথায় এক ঢাল লম্বা খোলা চুল, মাখন পেলব তার হাত মুখ, হরিণের মত কালো দুটি চোখ। ধনুকের মত লাল ঠোঁট। হাসলে গালে টোল পড়ছে। আর হাসি — ভুবন ভোলানো। সব মিলিয়ে, এক অদৃশ্য মায়া চোখটাকে কেমন যেন এক জায়গাতে স্থির করে রেখেছে। চোখাচোখি হতেই সম্বিত ফিরে এল। খুব তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ শেষ করে ক্যান্টিন থেকে বেড়িয়ে এলাম। বুঝতে পারছিলাম ক্যান্টিনে আমার যাতায়াতটা একটু বেড়ে গেছে। তোমার সাথে চোখাচোখি হলেই পালিয়ে আসতাম। বুঝতে পারতাম তুমি মুখ টিপে হাসছো।

সে বছর কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ঠিক হল তুমি উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবে। যথারীতি অন্যান্য বারের মত আমি ঘোষক। অনুষ্ঠানের বেশ কিছু আগেই তুমি গ্রীনরুমে ঘোরাঘুরি করছিলে। তোমার দিকে তাকিয়ে চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে। কি অপূর্ব সেজে ছিলে! তোমার গায়ে কেমন যেন পাগল করা এক অপূর্ব বিদেশী পারফিউমের গন্ধ।

চিঠি

নিজেই এগিয়ে এসে আলাপ জমিয়ে ছিলে। কথায় কথায় জেনে নিয়েছিলে কোথায় থাকি। তোমাকে দিয়েছিলাম বিধবা মাকে নিয়ে থাকা আমার কুঁড়ে ঘরের ঠিকানা। অনুষ্ঠানের পুরো সময়টা কাটিয়ে ছিলে আমার পাশে থেকে। মনে হয়ে ছিল খুব তাড়াতাড়িই যেন শেষ হয়ে গেল অনুষ্ঠানটা। সেই রাতে বাড়ি ফিরে, কত রাত পর্যন্ত জেগে ছিলাম জানিনা। পরের দিন কলেজে দেরি করে পৌঁছে ছিলাম। জানতে চেয়েছিলে শরীর খারাপ কিনা! একটা দীর্ঘ শ্বাস চেপে বলেছিলাম, "না এমনি দেরি করেই এসেছি।"

গরমের ছুটির পর কলেজ খুলল, আমার পড়ার চাপ বাড়ছে ফাইনাল ইয়ার। ক্যান্টিন যাওয়া এক প্রকার ছেড়ে দিয়েছি। একদিন করিডোরে বললে, "কলেজের পেছনে দেখা করতে।" ওদিকটাতে তখন সচরাচর কেউ খুব একটা যেত না। সবার দৃষ্টি এড়িয়ে দেখা করতে গেলাম। তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে। তখন কৃষ্ণচূড়া ফুলের সময়, গাছের নীচটা ফুল পড়ে লাল হয়ে আছে। মনে হচ্ছিল গাছটা তোমার জন্য কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে, পরনের লাল পোশাকের সাথে যেন একাত্ব হয়ে গেছে। বিকেলের পড়ন্ত রোদের আলোয় তোমাকে বড় মায়াবী লাগছিল। আমি কাছে যেতেই আমার হাতে একটা বই দিলে, প্রথম পাতায় লেখা, "উদাসীকে..." নীচে তোমার নাম। মনে মনে হেসে বলেছিলাম, কেন তোমার উদাসী মনে হয়েছিল

চিঠি

বা কেন তোমার উদাসী নামটা পছন্দ তা জানা হয়ে ওঠেনি। প্রশ্ন করেছিলাম, "হঠাৎ!" তুমি উল্টে জিজ্ঞাসা করেছিলে, "আমার কি কিছু দেওয়া বারণ!" ঠিক উত্তর দিতে পারিনি। তোমাকে দেবার মত কিছুই আমার ছিলনা, তাই একটা কৃষ্ণচূড়া ফুল তুলে তোমার চুলে গুঁজে দিয়েছিলাম। অনেক কথা বলেছিলে, তবু শেষ কথা যেন ছিল বাকি। গোধূলিতে তোমায় কলেজের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলাম। সেবার সেই সিজিনটাতে তুমি রোজ চুলে কৃষ্ণচূড়া ফুল গুঁজে আসতে। বান্ধবীদের কাছে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক নূতন ফ্যাশন উপহার দিয়েছিলে। বুঝতে পারছিলাম আমি কলেজের অন্য ছেলেদের কাছে কেমন যেন ঈর্ষার কারন হয়ে উঠছি।

বেলা শেষের মত কলেজ জীবন শেষ হয়ে এল। আমাদের ফেয়ারওয়েল দিন এগিয়ে এল। ফেয়ারওয়েলের দিন খুব ইচ্ছে ছিল আবার একবার তোমার গান শোনার। ইচ্ছেটা অপূর্ণ থেকে গেল। সারাটা দিন নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলে। ফেয়ারওয়েলে অনেকে অনেক কিছু বললেন। কর্ণ কুহোরে কিছু গেল, কিছু গেল না। আমার চোখ শুধু খুঁজে চলেছে একজনকে। নীচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা তাদের পছন্দের দাদা-দিদিদের নিজেদের পছন্দের উপহার তুলে দিচ্ছে। অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ লগ্নে তুমি এলে, হাতে একটা লাল গোলাপ নিয়ে। হাতটা শুধু এগিয়ে ধরে ছিলে,

চিঠি

অশ্রুসিক্ত চোখে গোলাপটা আমার হাতে দিয়ে কম্পিত ঠোঁট নিয়ে দৌড়ে বেড়িয়ে গিয়েছিলে। ভেবেছিলাম অনুষ্ঠানের শেষে আমার মনের কথাটা তোমায় জানাব।

"অনেক কিছু বলার ছিল , অনেক,
না বলা সে কথা,
শুধু একটি কথা,
যা কষ্ট করে হয়নি বলতে
আঁখিপাতে সঙ্গোপনে বুঝেছিলে তুমি
সত্যিই আমি তোমায় ভালবাসি।

হয়ত বা মনের বাঁধন ছিড়ে
কালবৈশাখী ওঠে
কম্পিত ভীরু কণ্ঠে শোনালে তাই,
তোমার অস্ফুট বাণী –
তুমি ভাল থেকো, ভুলনাকো।"

অনুষ্ঠান শেষে আমার চোখ দুটো পাগলের মত খুঁজে চলেছে তোমায়, দোতলার হল ঘরের বারান্দা থেকে দেখলাম তুমি তোমাদের বড় সাদা গাড়িতে চড়ে বেড়িয়ে গেলে, এক অব্যক্ত বেদনা নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়াছিলাম। সেই শেষ দেখা।

কয়েক বছর পরে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় তোমার ফার্স্ট-ক্লাস ফার্স্ট হবার খবরটা দেখেছিলাম। কিছুদিন পরে তুমি চিঠি লিখে জানিয়ে ছিলে সুখবরটা।

চিঠি

সুখবর যত না ছিল বেদনা ছিল তার থেকেও বেশি। তারপর...

ভাল থেকো। চিঠি দিও।

ইতি -

(*কবিতার অংশটি শ্রদ্ধেয় শ্রী রমেশ ঘোষ মহাশয়ের বিদায়বেলা কবিতা থেকে নেওয়া।) ■

যে প্রচলিত ভুলে করোনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের মাঝে।

প্রচলিত তিনটি ভুল

✕ এরা আমার সহকর্মী আমি তাদের সাথে মাস্ক ছাড়াই কথা বলতে পারি।

✕ এরা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাদের সাথে মাস্ক ব্যবহার ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়োজন নেই।

✕ উনারা আমার আত্মীয়, তাদের সাথে মাস্ক ছাড়াই মেলামেশা করা যায়।

উপরের তিনটি ভুল করা থেকে বিরত থাকুন এবং সঠিক ভাবে মাস্ক পরুন, নিজে বাঁচুন ও সমাজকে রক্ষা করুণ।

PREVENTION OF COVID - 19
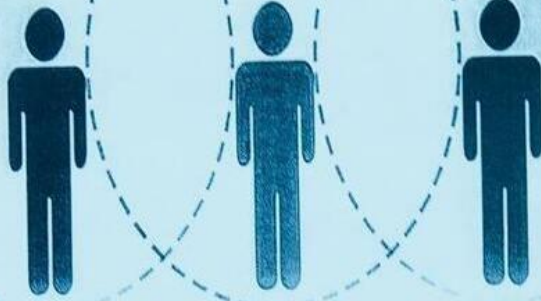
SOCIAL DISTANCING

Photo by Ekaterina Belinskaya from Pexels

PREVENTION OF COVID - 19
Photo by Anna Shvets from Pexels